IUCN

মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে
মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা সহায়িকা

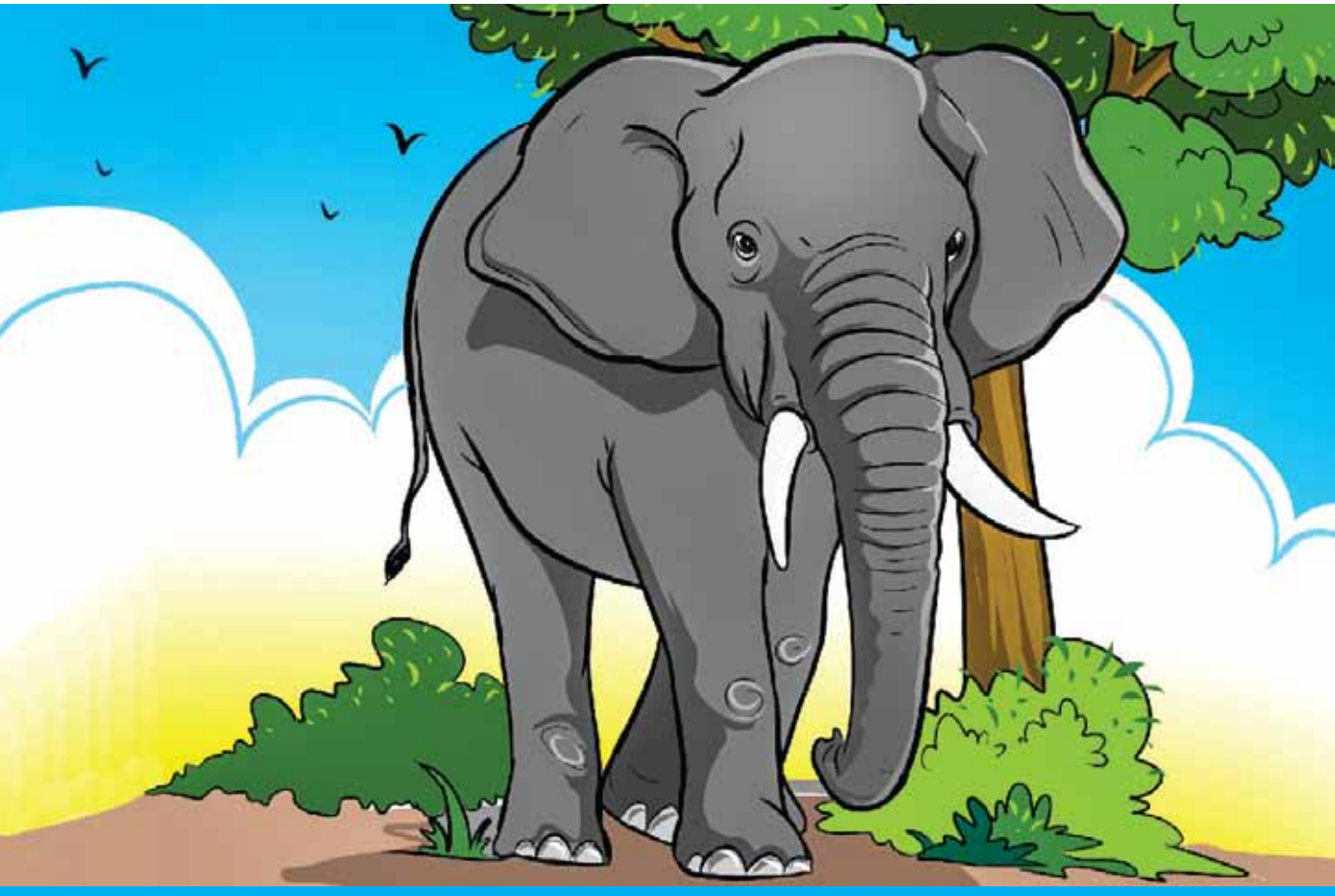

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার

বন অধিদপ্তর

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে
মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা সহায়িকা

সংকলন
মোঃ রফিকুল ইসলাম

পরিমার্জন ও রচনা
মোঃ আশরাফুল হক

সম্পাদনা
মোহাম্মদ আব্দুল মোতালেব
হাসীব মুহাম্মদ ইরফানুল্লাহ্

সহযোগিতা
মোহাম্মদ সুলতান আহমেদ
জুবাইর হুসনী ফাহাদ
রাজীব মাহমুদ
মোঃ মিজানুর রহমান

আইইউসিএন, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার
বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস
২০১৬

এই প্রকাশনাটি বাংলাদেশ বন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত ‘স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন’ প্রকল্পের আওতাধীন উপ-প্রকল্প ‘স্ট্যাটাস সার্ভে অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব এলিফ্যান্ট অ্যাকশন প্ল্যান ফর বাংলাদেশ’ অধীনে প্রকাশিত।

প্রকাশক : আইইউসিএন, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার, বাংলাদেশে কান্ট্রি অফিস।

কপিরাইট : © ২০১৬ বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর ও আইইউসিএন, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার এন্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস।

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতাস্বীকার সাপেক্ষে, স্বত্বাধিকারী ও লেখকগণের পূর্ব অনুমতি ছাড়া শিক্ষামূলক কাজে এই প্রকাশনাটি ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে স্বত্বাধিকারী ও লেখকগণের লিখিত অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিক স্বার্থে এই প্রকাশনার কোনো অংশ প্রতিবেদন, পরিবর্তন বা অন্য কোনো উপায়ে ব্যবহার করা যাবে না।

অঙ্গসজ্জা : শেখ আসাদুজ্জামান

অঙ্কন : জুনায়েদ আজিম চৌধুরী

ভাষা সম্পাদনা : বরুণ দাস

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৩৪-৮

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০১৬

মুদ্রণ : প্রগ্রেসিভ প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ

যোগাযোগ : আইইউসিএন
বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস
বাড়ি নং - ১৬, সড়ক নং - ২/৩, বনানী
ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ

প্রধান বন সংরক্ষকের বার্তা

‘হাতি’ দুই অক্ষরের খুব ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু এই ছোট্ট শব্দটিই বর্তমান পৃথিবীর স্থলভাগের সবচাইতে বৃহত্তম প্রাণীর নাম। বর্তমান পৃথিবীতে মাত্র দুই প্রজাতির হাতির দেখা মেলে– আফ্রিকান আর এশিয়ান। এর মধ্যে এশিয়ান হাতি টিকে আছে বাংলাদেশসহ বিশ্বের মাত্র ১৩টি দেশে।

গত ৫০ বছরে মানবসৃষ্ট নানা কারণে গোটা পৃথিবী থেকে অর্ধেকেরও বেশি এশিয়ান হাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশের প্রায় সব বনাঞ্চলেই হাতির দেখা মিললেও এখন তা টিকে আছে বাংলাদেশের হাতেগোনা কিছু অঞ্চলে। আইইউসিএন, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার ইতিমধ্যে বাংলাদেশের হাতিকে মহাবিপদাপন্ন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।

বাংলাদেশে মাঠপর্যায়ে হাতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বড় বাধা মানুষ-হাতির সংঘাত। ক্রমবর্ধমান সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ না থাকার কারণে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ফসল-সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, হুমকির মুখে পড়ছে জীবন, তেমনি মানুষের মধ্যেও তৈরি হচ্ছে হাতি সম্পর্কে বৈরী ধারণার। অথচ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া কোনোভাবেই হুমকির মুখে টিকে থাকা হাতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে হাতি সংরক্ষণে বৃহত্তর পরিসরে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ ইতিপূর্বে বাংলাদেশে নেয়া হয়নি। সম্প্রতি বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর ও আইইউসিএন বাংলাদেশ, Status Survey & Development of Elephant Action Plan for Bangladesh প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে মানুষ-হাতির সংঘাত নিরসনে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে তৈরি করা হয়েছে এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম, যে টিমের সদস্যরা আপদকালীন পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষ-হাতির সংঘাত নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এ প্রকাশনাটি আইইউসিএন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মানুষ-হাতির সংঘাত নিরসন তথা হাতি সংরক্ষণে মাঠপর্যায়ের একটি সহায়িকা। সহায়িকাটিতে মানুষ-হাতির সংঘাতের প্রকৃতি, প্রভাব, সংঘাত নিরসনে প্রতিকার ও তাৎক্ষণিক করণীয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের, যেমন– বন অধিদপ্তর, এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবহার উপযোগী করে আলোচনা করা হয়েছে।

সহায়িকাটি মাঠ পর্যায়ে মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসন করে হাতি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

ঢাকা
সেপ্টেম্বর ২০১৬

মোঃ ইউনুছ আলী
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

© আইইউসিএন/ সুলতান আহমেদ

মুখবন্ধ

হাতি স্থলভাগের সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী। পরিবেশের সংরক্ষণ ও ভারসাম্য রক্ষায়ও রয়েছে হাতির অবদান। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতেও হাতি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ক্রমান্বয়ে হাতির আবাস্থল হ্রাস, খাদ্য ঘাটতি ও মানুষ-হাতি সংঘাতের ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিটি আজ হুমকির সম্মুখীন।

মহাবিপন্ন এই হাতি সংরক্ষণে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ বন বিভাগ ও আইইউসিএন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন প্রকল্পের আওতায় স্ট্যাটাস সার্ভে এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব এলিফ্যান্ট অ্যাকশন প্ল্যান ফর বাংলাদেশ উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে হাতি ও হাতির আবাসস্থলের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ, হাতি চলাচলের রাস্তা সুনির্দিষ্টকরণ, হাতি-মানুষ সংঘাত নিরসন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনকল্পে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করার লক্ষ্যেই এই সহায়িকাটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

হাতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসন খুব জরুরি একটি বিষয়। এই জন্য প্রয়োজন হাতি, হাতির আবাসস্থল ও তার জীবনযাত্রা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। সেইদিক বিবেচনায় মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা সহায়িকা বইটি মানুষ-হাতি সংঘাত ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই বইটিতে হাতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার পাশাপাশি মানুষ-হাতি সংঘাতের গতি ও প্রকৃতি, সংঘাত নিরসনে মাঠ পর্যায়ে করণীয় ও সংঘাত ব্যবস্থাপনায় এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিমের করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহায়িকাটিতে ব্যবহৃত অনেক সংখ্যাই মূলত গড় মান। বাংলাদেশে বিচরণ করা এশিয়ান হাতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অনেক তথ্যই এখনো অজানা। রয়েছে পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব। কিন্তু তারপরও কিছু ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে অভিজ্ঞতালব্ধ গড় মান দ্বারাই ভালোভাবে কিছু বিষয় নির্দেশ করা যায়; যেমন– হাতির ওজন, খাদ্যের চাহিদা ইত্যাদি। তাই একথা মনে রাখা জরুরি, গড় মান ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রকৃত সংখ্যার কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। তবুও যে তথ্য ও উপাত্ত এই সহায়কাটিতে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো মাঠপর্যায়ে স্থানীয় বন বিভাগ, জনপ্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম ও গ্রামবাসীসহ সকলের জন্য অত্যন্ত কার্যকরি ভূমিকা পালন করবে।

ঢাকা
সেপ্টেম্বর ২০১৬

আব্দুল মাবুদ
বন সংরক্ষক ও প্রকল্প পরিচালক, SRCWP প্রকল্প
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা সহায়িকা বইটি বাংলাদেশ বন বিভাগ ও আইইউসিএন বাংলাদেশের একটি যৌথ প্রয়াস। মাঠ পর্যায়ে লব্ধ কাজের অভিজ্ঞতা, মানুষ-হাতির সংঘাত নিরসনে প্রচলিত পদ্ধতি ও লোকজ জ্ঞান, এ বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, দেশজ পটভূমি ও উপাদান ইত্যাদি সন্নিবেশনের মাধ্যমে এই প্রকাশনাটিকে আমরা বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেছি। তৃনমূল পর্যায়ে মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে করণীয় ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সহায়কাটিতে চট্টগ্রাম, বান্দরবান, শেরপুর, জামালপুর ও নেত্রকোনা জেলায় হাতি সংরক্ষণে চলমান বিভিন্ন পরীক্ষামূলক প্রকল্প থেকে তথ্য ও মাঠ পর্যায়ে লব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রকাশনাটির সার্বিক গবেষণা, সংকলন, সম্পাদনা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে সহজবোধ্য পাঠ রচনার প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে তথ্য-উপাত্ত প্রদান করে সহায়তা করেছেন আইইউসিএন বাংলাদেশের হাতি সংরক্ষণ প্রকল্পের কর্মীরা যাদের মধ্যে জুবাইর হুসনী ফাহাদ, মোহাম্মদ সুলতান আহমেদ, রাজীব মাহমুদ, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ আহসানুল ওয়াহেদ, ফজলে আরাফাত, রূপন বড়ুয়া, বাবলা মহাজন ও ইকরাম উদ্দিন আল আমরান অন্যতম। প্রকাশনাটির বিষয়গত দিক থেকে শুরু করে সুচিন্তিত মতামত ও দিকনির্দেশনা দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আইইউসিএন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর হাসীব মুহাম্মদ ইরফানুল্লাহকে। সুচারুভাবে বইটি সম্পাদনা করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি উক্ত প্রকল্পের ম্যানেজার মোঃ আব্দুল মোতালেবকে। ধৈর্য্য সহকারে এই বইটিতে পরিমার্জন ও তথ্য সন্নিবেশ করার জন্য মোঃ আশরাফুল হককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও, প্রকাশনাটির মুদ্রণ কাজে সহযোগিতা করার জন্য শেখ আসাদুজ্জামানের নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বইটির চূড়ান্ত খসড়ায় সুচিন্তিত মতামত প্রদান করার জন্য প্রাক্তন উপ-প্রধান বন সংরক্ষক ও প্রকল্প পরিচালক, SRCWP প্রকল্প, মোঃ আকবর হোসেন-এর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও আব্দুল মাবুদ, বন সংরক্ষক ও বর্তমান প্রকল্প পরিচালক, SRCWP প্রকল্প এর নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁর গঠনমূলক মতামত প্রদান করার জন্য।

তথ্যের যথার্থতা নিরূপণ ও সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ বন বিভাগের অন্তর্গত হাতি প্রবণ এলাকাগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঢাকা
সেপ্টেম্বর ২০১৬

ইশতিয়াক উদ্দীন আহমদ
কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ
আইইউসিএন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায় ১। ভূমিকা

১.১ ব্যবস্থাপনা সহায়িকার উদ্দেশ্য ১০
১.২ মানুষ-হাতি সংঘাত কী? ১০
১.৩ মানুষ-হাতি সংঘাতের প্রভাব ১১
১.৪ মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসন কেন জরুরি? ১১
১.৫ মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে আমাদের করণীয় ১১

অধ্যায় ২। হাতি : প্রাথমিক ধারণা

২.১ হাতি : প্রাসঙ্গিক তথ্য ১৩
২.২ হাতির উপকারিতা ১৫
২.৩ বাংলাদেশে হাতির বিচরণ ও বিস্তৃতি ১৬
২.৪ বাংলাদেশে হাতির ঝুঁকি ও আসন্ন বিপদ ১৮

অধ্যায় ৩। মানুষ-হাতি সংঘাত

৩.১ মানুষ-হাতি সংঘাতের গতি ও প্রকৃতি ২১
৩.২ মানুষ-হাতি সংঘাতের কারণসমূহ ২২
৩.৩ মানুষ-হাতি সংঘাতের প্রতিকারসমূহ ২৩

অধ্যায় ৪। সংঘাত নিরসনে মাঠপর্যায়ের করণীয়

৪.১ সংঘাতকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতি ৩২
৪.২ সংঘাতকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে করণীয় ৩৩
৪.৩ মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে স্থানীয় মানুষের ভূমিকা ৩৮
৪.৪ মানুষ-হাতি সংঘাতে ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ও করণীয় ৪০
৪.৫ মানুষ-হাতি সংঘাত ব্যবস্থাপনায় সতর্কতা ৪৩

অধ্যায় ৫। এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম

৫.১ এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম কী? ৪৫
৫.২ এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠনের উদ্দেশ্য ৪৫
৫.৩ এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম সদস্যদের কাজ ৪৬

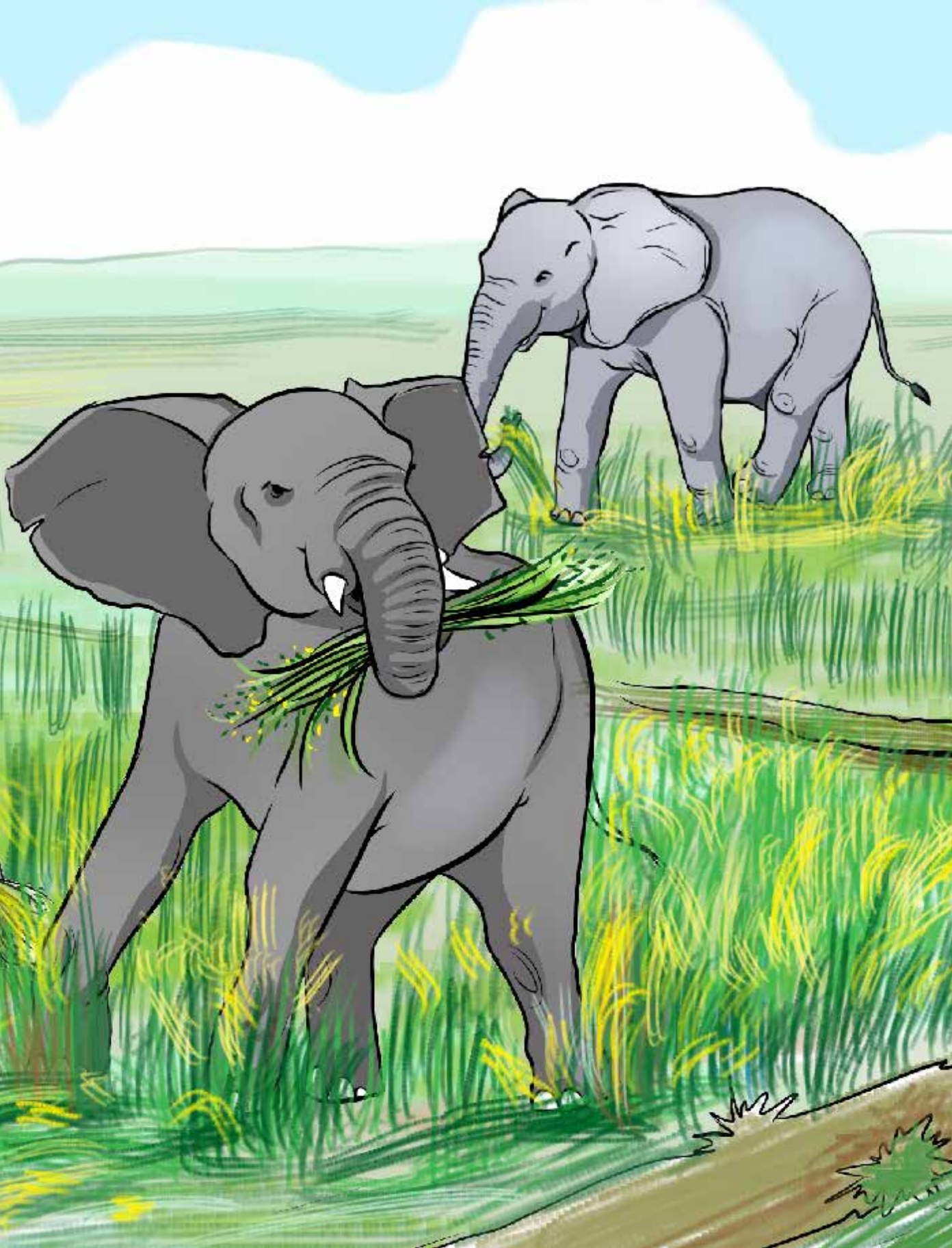

অধ্যায় ১

ভূমিকা

- ব্যবস্থাপনা সহায়িকার উদ্দেশ্য
- মানুষ-হাতি সংঘাত কী?
- মানুষ-হাতি সংঘাতের প্রভাব
- মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসন কেন জরুরি?
- মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে আমাদের করনীয়

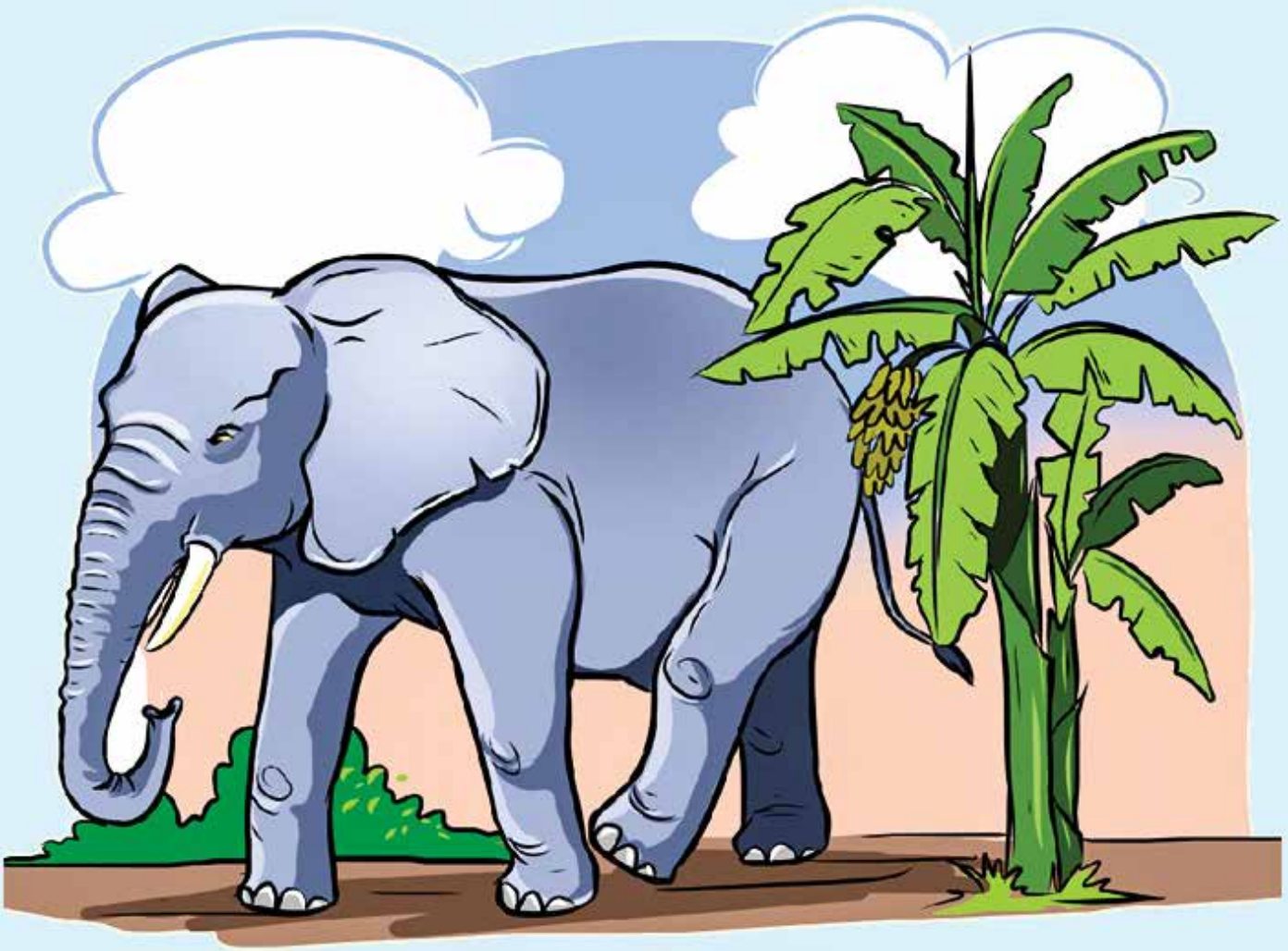

১.১ ব্যবস্থাপনা সহায়িকার উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের হাতির বিচরণ, বিস্তৃতি ও আসন্ন বিপদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা
- মানুষ-হাতির সংঘাত, সংঘাতের কারণ ও সংঘাত কমিয়ে আনার উপায় সম্পর্কে জানা
- সংঘাত নিরসনে মাঠ পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে জানা
- সংঘাত নিরসনে এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে জানা

১.২ মানুষ-হাতি সংঘাত কী?

সময়ের সাথে সাথে বাড়তি মানুষের বাসস্থান ও খাবারের যোগান দিতে, নতুন কৃষি জমি ও শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে প্রয়োজন হচ্ছে নতুন ভূমির। ভূমির ক্রমবর্ধমান চাহিদার এই চাপ শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ছে টিকে থাকা বনাঞ্চলের উপর। অব্যাহতভাবে বনাঞ্চল কমে যাওয়ার কারণে হাতিরা হারাচ্ছে তাদের আবাসস্থল, ফুরিয়ে যাচ্ছে তাদের খাবারের উৎস। প্রায়ই মানুষ ও হাতি মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সংঘাতের। মানুষ এবং হাতির এই বিপরীত এবং দ্বন্দ্বমুখী অবস্থানের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগকে বলা হয় মানুষ-হাতির সংঘাত।

১.৩ মানুষ-হাতি সংঘাতের প্রভাব

মানুষ-হাতি সংঘাতের প্রভাব বহুমুখী। একদিকে হাতির আক্রমণে বিনষ্ট হচ্ছে ধানসহ নানা ধরনের ফসল, অন্যদিকে উপর্যুপরি আক্রমণে অনেক আবাদি কৃষিজমি পরিণত হচ্ছে পতিত জমিতে, ফলে প্রতিনিয়ত ক্ষতির শিকার হচ্ছে কৃষক। আবার প্রায়ই হাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্রামবাসীর ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সম্পদ। এমনকি হাতির আক্রমণের শিকার হয়ে অনেক মানুষ আহত হচ্ছে, জীবনও হারাচ্ছে। আত্মরক্ষার্থে কিংবা মানুষের প্রতিশোধপরায়ণ আচরণের শিকার হয়ে অনেক সময় হাতিও মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে। বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে ২০০৩ সাল থেকে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত প্রায় ২৩০ জনেরও বেশি মানুষ হাতির আক্রমণে নিহত হয়েছে। আর মানুষের হাতে প্রাণ গিয়েছে ৬২টি হাতির।

১.৪ মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসন কেন জরুরি?

মানুষ-হাতির সংঘাত কমিয়ে আনলে

- হাতির আক্রমণ থেকে ফসল, ঘরবাড়ি, অন্যান্য সম্পদ ও মানুষের জীবন রক্ষা হবে
- প্রতিশোধপরায়ণ আচরণের বশবর্তী মানুষের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে মহাবিপদাপন্ন হাতি রক্ষা পাবে
- সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে হাতি সম্পর্কে বৈরী মনোভাব কমে আসবে, ফলে দীর্ঘমেয়াদে হাতি সংরক্ষণ সহজতর হবে

১.৫ মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে আমাদের করণীয়

- স্থানীয়পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সক্ষমতা তৈরি করা
- সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা
- দীর্ঘ মেয়াদে মানুষ-হাতির সংঘাত নিরসনে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে অন্তর্ভুক্ত করা

অধ্যায় ২

হাতি: প্রাথমিক ধারণা

- হাতি: প্রাসঙ্গিক তথ্য
- হাতির উপকারিতা
- বাংলাদেশে হাতির বিচরণ ও বিস্তৃতি
- বাংলাদেশে হাতির ঝুঁকি ও আসন্ন বিপদ

২.১ হাতি : প্রাসঙ্গিক তথ্য

হাতি বর্তমান পৃথিবীতে স্থলভাগের সবচাইতে বৃহত্তম প্রাণী। পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই হাতিকে বলা হয় বনের সুস্বাস্থ্যের প্রতীক। হাতির গাছের মতো শক্ত চারটি মোটা পা এবং কুলোর মতো বড় দুটি কান রয়েছে। হাতির রয়েছে রশির মতো একটা লম্বা লেজ, এটা দিয়ে সে মশা-মাছি ও পোকা-মাকড় তাড়ায়। রয়েছে বিশাল দেয়ালের মতো রুক্ষ চামড়ার একটি পেট। হাতির সবচাইতে বিচিত্র যে জিনিসটি রয়েছে, সেটি হলো তার শুঁড়। দেখতে সাপের মতো এই শুঁড়ের শক্তি অদম্য। শুঁড় দিয়ে সে অনেক কাজ করে– শ্বাস নেয়, হাতের মতো ব্যবহার করে কোনো কিছু তুলে আনে, পানি ছিটিয়ে গোসল করে, এমনকি শুঁড় তুলে নতুন কাউকে অভিবাদনও জানায়। এছাড়াও পুরুষ হাতির রয়েছে তলোয়ারের মতো তীক্ষ্ণ দুটি দাঁত। এগুলো সে লড়াই এর সময় ব্যবহার করে। অনেক সময় খাবার আর পানি খুঁজতে গিয়ে সে দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে ফেলে। হাতি দেখতে যেমন বিশাল, তেমনি হাতি সম্পর্কে রয়েছে অনেক বিচিত্র তথ্যও। তাহলে দেখে নেয়া যাক হাতি সম্পর্কে কিছু চমকপ্রদ তথ্য।

আকার/আকৃতি একটি প্রাপ্তবয়স্ক হাতির উচ্চতা সাধারণত ৭-১০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে এবং লেজের আগা থেকে শুঁড়ের মাথা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮-২৫ ফুটের মতো হতে পারে। গড়ে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক হাতির ওজন ৩,০০০-৫,০০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

জীবনাচরণ হাতি খুব শান্ত ও সরল এক প্রাণী। মানুষের মতোই দল বেঁধে চলতে, ঘুরতে, ঘুমাতে ভালোবাসে। প্রতিটি দলে সাধারণত ৫-২৫টি করে হাতি থাকতে পারে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এর চেয়েও বেশি হাতি একটি দলে থাকতে পারে।

বাসস্থান খাদ্য, পানি ও নিরাপদ আবাসের পর্যাপ্ততা আছে এমন যে কোনো বনাঞ্চলেই হাতি বাস করতে পারে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, একটি স্ত্রী হাতির আবাসস্থল প্রায় ৪০ থেকে ৮০০ বর্গ কিমি. পর্যন্ত হতে পারে এবং একটি পুরুষ হাতির আবাসস্থল হতে পারে ২০০ থেকে ২৫০ বর্গ কিমি.।

আয়ুষ্কাল একটি হাতি সাধারণত ৬০-৭০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। এদের ছয়বার পর্যন্ত দাঁত গজায়। এ দাঁতগুলো খাবার চিবানোর ফলে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে পড়ে যায়। ১০ বছর পর পর নতুন করে দাঁত গজায়। শেষ দশকের পর যখন আর দাঁত গজায় না তখন ধীরে ধীরে হাতির জীবনাবসান ঘটে।

খাদ্য ও পানি পান হাতি তৃণভোজী প্রাণী। দিনের প্রায় ১৬-২০ ঘণ্টা এরা খাবার খুঁজে কাটিয়ে দিতে পারে। কচি বাঁশ, বিভিন্ন প্রকার গাছ, গাছের বাকল, মূল, পাতা, লতাপাতা, ঘাস, ফলমূল ইত্যাদি হাতির খুব প্রিয় খাবার। উল্লিখিত খাদ্যের অভাব দেখা দিলে হাতি অনেক সময় কৃষিফসল/শস্য, যেমন ধান, গম ও আঁখও খেয়ে থাকে। সাধারণত একটি প্রাপ্তবয়স্ক হাতি দিনে প্রায় ১৫০ কেজি খাবার ও ২১০ লিটার পর্যন্ত পানি গ্রহণ করে থাকে।

গর্ভকাল ও পূর্ণতা হাতি প্রায় ২২ মাস গর্ভধারণ করার পর বাচ্চার জন্ম দিয়ে থাকে। সাধারণত প্রতিবারে হাতি একটি করে বাচ্চা প্রসব করে থাকে। জন্মের সময় একটি বাচ্চা হাতির ওজন সাধারণত ৮০-১০০ কেজির মধ্যে হয়ে থাকে। প্রায় ৭ বছর বয়সে হাতি শারীরিক পূর্ণতা পায় এবং ১৪-১৫ বছর বয়সে যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। সাধারণত দুটি সন্তান জন্ম দেয়ার মাঝে একটি হাতির ৩-৫ বছরের বিরতি প্রয়োজন হয়।

চলাচল খাবারের খোঁজে হাতিকে প্রায় সারাদিনই চলাচলের মধ্যে থাকতে হয়। খুব ভোর থেকে শুরু করে দিনের প্রায় ২০ ঘণ্টাই হাতি খাবারের খোঁজে চলাচল করে। একটি মজার ব্যাপার হলো, হাতিকে একদম শান্ত দেখতে পাওয়াটা বেশ বিরল ঘটনা। প্রায় সবসময়ই হাতির লেজ, শুঁড়, কান বা কোনো না কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়ার মধ্যেই থাকে। আরেকটি মজার তথ্য হলো, এক বন থেকে অন্য বনে যাওয়ার জন্য হাতি সবসময়ই নির্দিষ্ট একটি পথই ব্যবহার করে থাকে, যে পথ সম্পর্কে তারা তাদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে ধারণা পেয়ে থাকে। এরা দিনে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে। এদের স্বাভাবিক হাটার গতি ঘণ্টায় ৫ থেকে ৭ মাইল।

যোগাযোগ হাতি এক ধরনের বিশেষ শব্দ সৃষ্টি করার মাধ্যমে নিজেদের যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। এছাড়াও হাতির ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। তারা বনে চলাফেরা করতে থাকা মানুষের গায়ের গন্ধও অনেক আগে থেকেই পেয়ে থাকে। বেড়াল আর কুকুরের ঘ্রাণশক্তিও হাতির তুলনায় খুবই নগণ্য। হাতি তিন মাইল দূর থেকেই পানির উপস্থিতি টের পায়।

২.২ হাতির উপকারিতা

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সাথে হাতির সখ্য, বন্ধুত্ব ও সংঘাত। হাতি প্রকৃতির সন্তান, তাই প্রকৃতিতে হাতির অবদান অনেক।

- হাতি যেমন খায়, তেমন মলও ত্যাগ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি দিনে প্রায় ১৫০ কেজি খাবার খেয়ে থাকে এবং প্রায় ১৬-১৮ বার মল ত্যাগ করে। এই মলের মোট ওজন ১০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। হাতির এই মল মাটিতে মিশে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং মাটিতে নানা ধরনের ফলের বীজ ছড়িয়ে দিতে সহযোগিতা করে।

- হাতি যেখান দিয়ে চলাচল করে সেখানকার গাছপালা বা জঙ্গলের মাঝ দিয়ে হাতি হেঁটে যাওয়ার ফলে বড় রকমের সুড়ঙ্গের মতো পথ তৈরি হয়। এতে করে বনের অন্যান্য প্রাণী সহজে এ রাস্তায় চলাচল করতে পারে। একই সাথে এই নালার মতো জায়গা দিয়ে বর্ষাকালে পানি প্রবাহিত হয়, যা বনের জন্য খুবই উপকারী।

- হাতি খুব ওজনদার প্রাণী। এর ফলে সে যেখান দিয়ে হাঁটে সেখানে তার পায়ের চাপে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়। বর্ষাকালে অঝোর ধারায় ঝরতে থাকা মিঠাপানি সেই গর্তে এসে জমে। এতে করে বনের অন্য প্রাণীদের খাবার পানির জোগান হয়।

- হাতি যখন হাঁটে তখন সামনে যা পায় সব পায়ের তলায় পিষে এগিয়ে যায়। এভাবে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে যাবার সময় অনেক ধরনের পোকামাকড় ভয় পেয়ে বেরিয়ে পড়ে। বনের পাখিরা তখন সেগুলো ধরে খায়। এতে করে পাখিদের খাদ্য সংকটেরও সমাধান হয়।

- হাতির মল থেকে কাগজ, নোটবুক ইত্যাদি তৈরি করা যায়।
- হাতি না থাকলে বনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে যাবে।

২.৩ বাংলাদেশে হাতির বিচরণ ও বিস্তৃতি

প্রায় ১০০ বছর আগে এদেশের প্রায় সব ধরনের বনেই হাতি দেখা যেত। কালক্রমে মানুষ যত বেড়েছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে কমেছে হাতির সংখ্যা। এখন আর বাংলাদেশের সব বনাঞ্চলে হাতির বিচরণ লক্ষ্য করা যায় না।

বাংলাদেশে হাতির সংখ্যা গণনার সর্বশেষ সমীক্ষাটি করা হয়েছে ২০১৬ সালে। সে সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে স্থায়ী হাতির সংখ্যা হচ্ছে ২১০-৩৩০টি। এছাড়াও বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশের মধ্যবর্তী সীমানা দিয়ে চলাচলকারী অভিবাসী হাতির সংখ্যা হচ্ছে ৭৯-১০৭টি। একই সমীক্ষায় সারাদেশে পোষা হাতির মোট সংখ্যা উল্লেখ করা হয় ৯৬টি, যার ৪২টি পুরুষ ও ৫৪টি স্ত্রী।

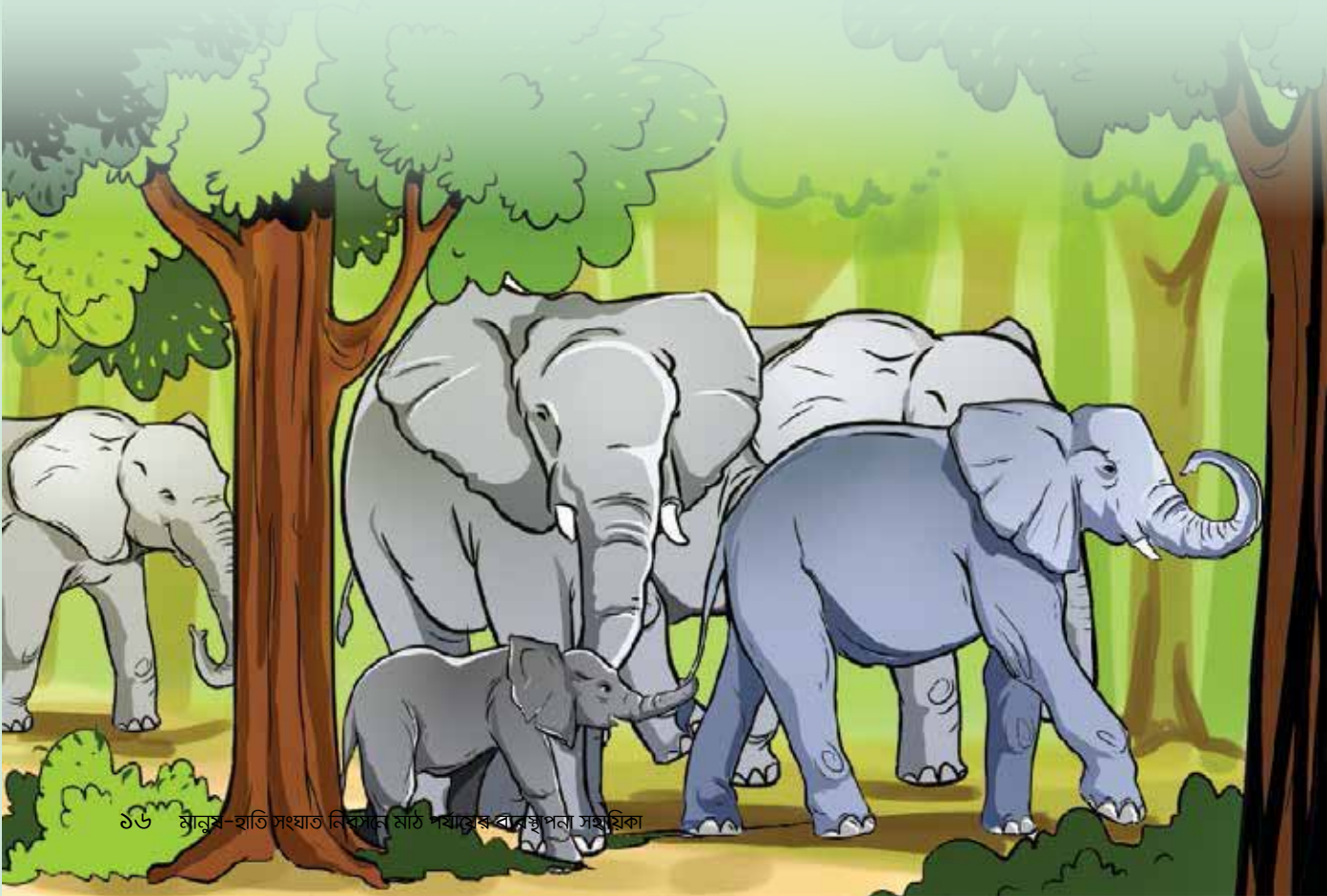

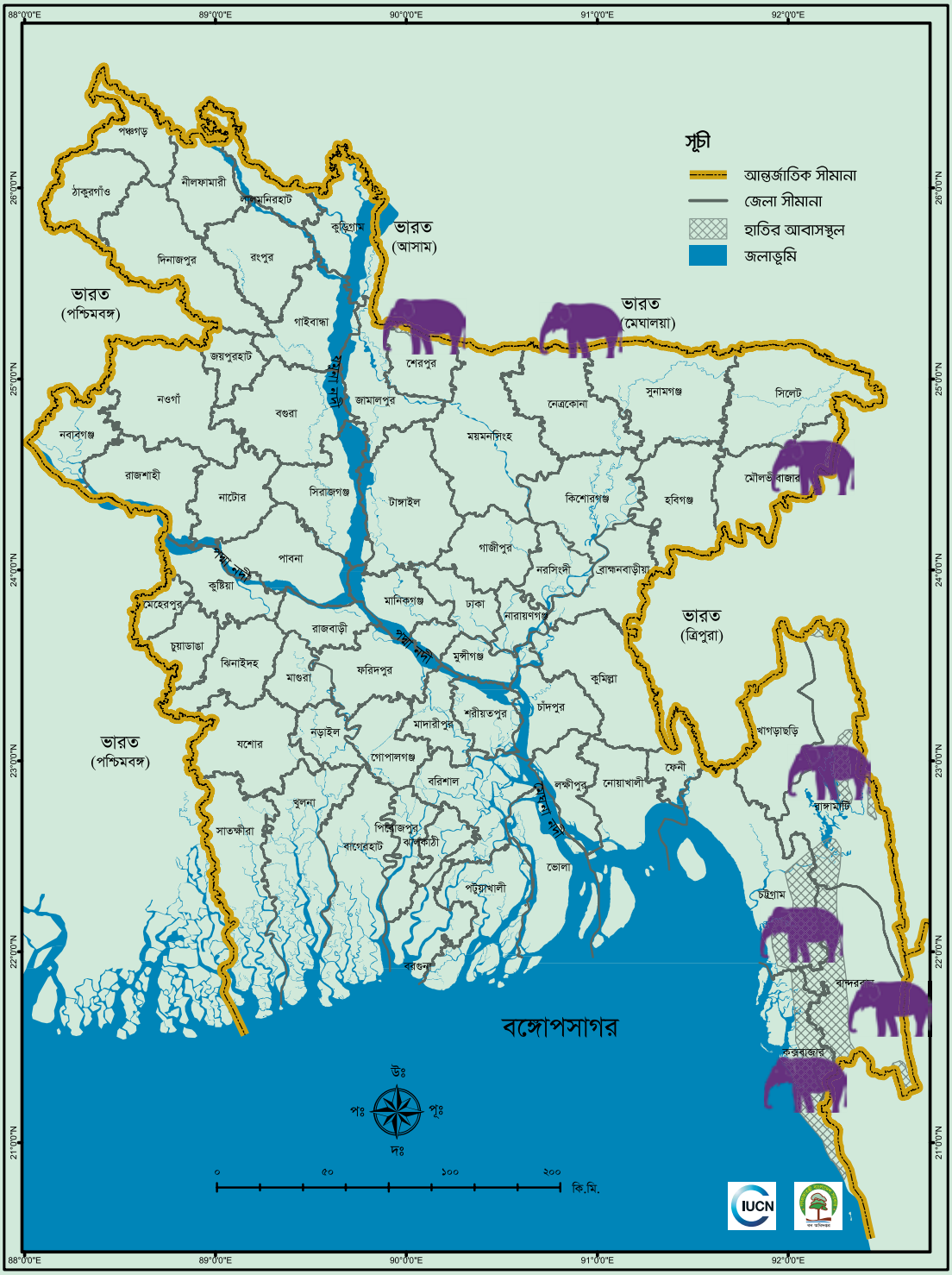

বাংলাদেশে হাতির বিচরণ ও বিস্তৃতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বৃহত্তর চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙামাটি ও কক্সবাজারের বনাঞ্চলগুলোতে স্থায়ী হাতির বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন)-এর ২০১৬ সালে দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বন বিভাগের চট্টগ্রাম দক্ষিণ অঞ্চলে স্থায়ী হাতি রয়েছে ৫০ থেকে ৭৮টি, কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগ মিলিয়ে আছে ৯২ থেকে ১৪৫টি। বান্দরবানে রয়েছে ৯ থেকে ১৪টি এবং লামা বিভাগে আছে ২৩ থেকে ৩৯টি হাতি। এছাড়া রাঙামাটি উত্তর বিভাগে আরো ১৩ থেকে ২১টি এবং দক্ষিণ বিভাগে ২২ থেকে ৩৩টি হাতি রয়েছে।

অভিবাসী হাতি বলতে সেগুলোকে বোঝায় যেগুলো বাংলাদেশের স্থায়ী হাতি নয়। এরা পার্শ্ববর্তী দেশ, যেমন ভারত বা মিয়ানমারের সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে চলে আসে। এই অভিবাসী হাতিরা আবার সবাই এক জায়গাতে আসে না, দেশের বিভিন্ন এলাকাতে এদের আলাদা আলাদা দলে দেখা যায়। এর মধ্যে সিলেট ও মৌলভীবাজারে রয়েছে ১০ থেকে ১৪টি হাতি, ময়মনসিংহ বন বিভাগের শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী, শ্রীবর্দী, জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ এবং নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলায় ৪৪ থেকে ৫৮টি হাতি রয়েছে। এছাড়াও রাঙামাটি দক্ষিণ বন বিভাগের কাসালংএ আছে ১০ থেকে ১৫টি এবং বান্দরবানের সাঙ্গুতে রয়েছে ১৫ থেকে ২০টি হাতি।

২.৪ বাংলাদেশে হাতির ঝুঁকি ও আসন্ন বিপদ

পৃথিবীর সবচাইতে বড় স্থলচর প্রাণী হয়েও হাতি কিন্তু বিপদের বাইরে নয়। বরং আকারে বড় হওয়ার কারণে সে-ই সবচাইতে বেশি বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য হাতির খাবারের প্রয়োজন হয় অনেক। আর এ খাবারের সন্ধানে তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাইলের পর মাইল পথ ঘুরে বেড়াতে হয়– কখনো সমতলে তো কখনো পাহাড়ে, কখনো পেট সমান উঁচু সবুজ ঘাসে, আবার কখনো শুঁড়-মাথা সব হারিয়ে যাওয়া গভীর গহিন জঙ্গলে। সেখানে নানা রকমের প্রাকৃতিক বিপদ যেমন থাকে, তেমনি থাকে মানুষের পাতা ফাঁদ। গত ১৩ বছরে শুধু বাংলাদেশেই মানুষের হাতে ৬২টি হাতি মারা পড়েছে। বন বিভাগের হিসাবমতে, ২০১০ সালে এ দেশে মানুষের হাতে মারা পড়েছে চারটি হাতি। ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে প্রতিবছর মারা পড়েছে পাঁচটি করে। ২০১৪ সালে এ সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে সাতটিতে। অতীতের হিসাব বাদ দিলেও দেখা যায়, ২০১৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনটি হাতি মারা পড়েছে। এ সংখ্যা কোনোভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না।

বন্যহাতিকে প্রতিনিয়ত নানা রকমের বিপদের মধ্য দিয়ে জীবন পার করতে হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে তাদের বাসস্থান বা বিচরণভূমি কমে যাওয়া, খাবার কমে যাওয়া, অপরিকল্পিত বনায়ন করা, শুকনো মৌসুমে পানি কমে যাওয়া, হাতির খাদ্য নয় এমন কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদের দ্বারা একক বন তৈরি করা, যেমন সেগুন, রাবার, চা এবং অন্যান্য ফসল চাষ করা। এছাড়া বনের ভেতরে ও বাইরে মানুষের তৎপরতাও হাতির জন্য

ঝুঁকিপূর্ণ। দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় দুই দেশের আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণে ব্যবহৃত কাঁটাতারও হাতির জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বন্যহাতি তো আর মানুষ না যে দেশের সীমানা বুঝবে। এর ফলে কাঁটাতারের সাথে জড়িয়ে বা বৈদ্যুতিক তারের সাথে লেগে প্রাণ হারাচ্ছে হাতিরা। এছাড়াও পৃথিবীর অনেক জায়গায় ট্রেন লাইনে ট্রেনের সাথে ধাক্কা লেগেও হাতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে।

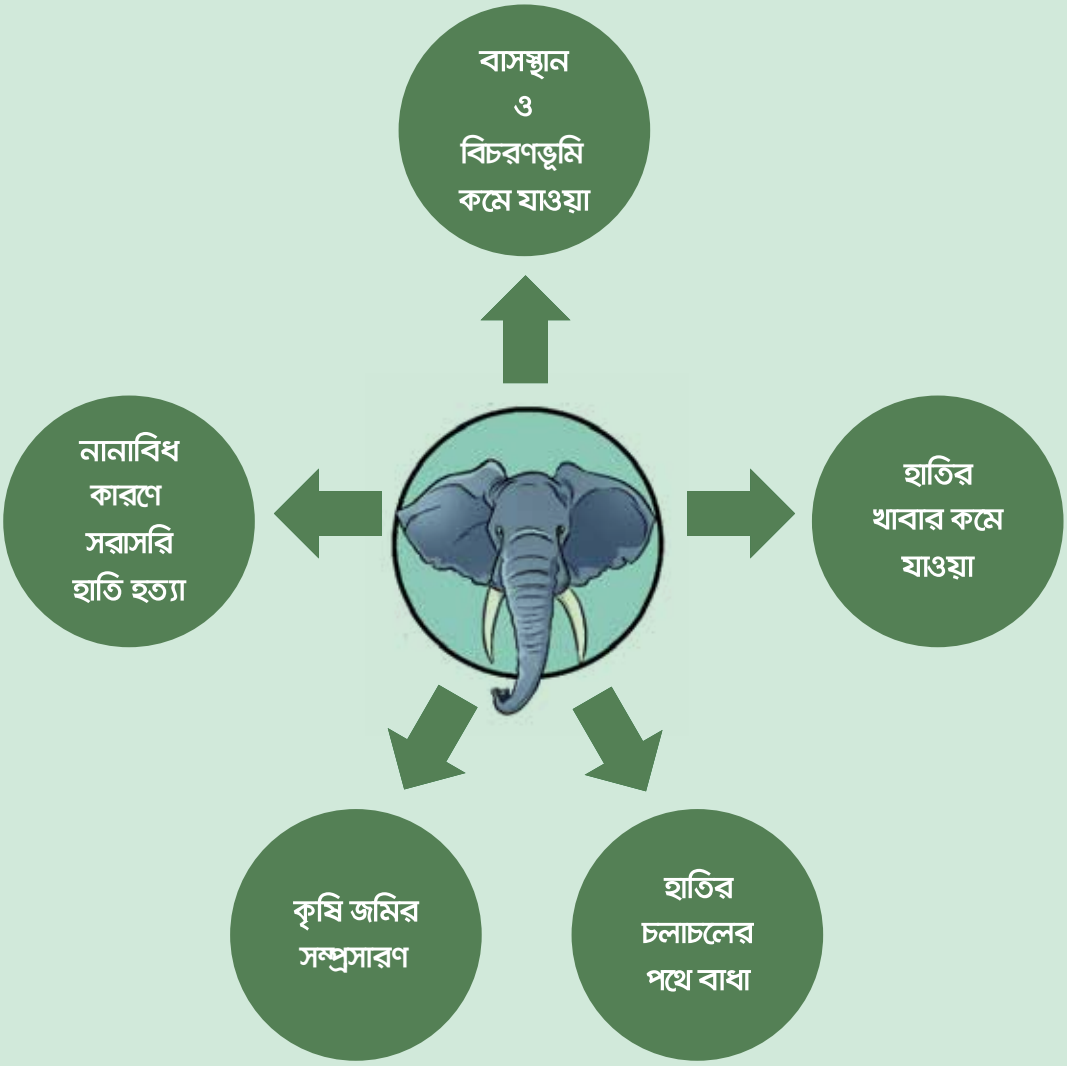

বাংলাদেশে হাতির ঝুঁকি ও বিপদ

অধ্যায় ৩

মানুষ-হাতি সংঘাত

- মানুষ-হাতি সংঘাতের গতি ও প্রকৃতি
- মানুষ-হাতি সংঘাতের কারণসমূহ
- মানুষ-হাতি সংঘাতের প্রতিকারসমূহ

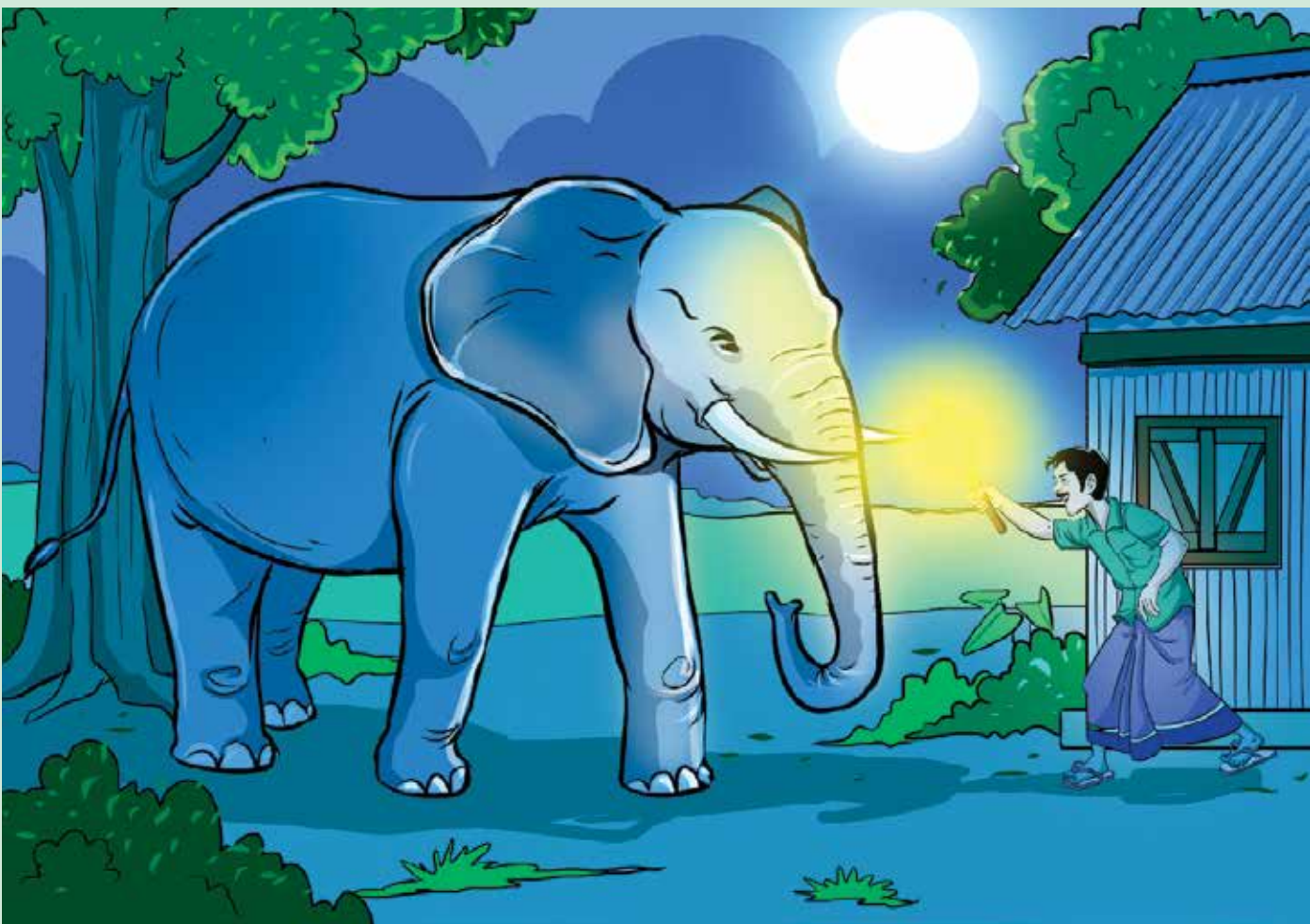

৩.১ মানুষ-হাতি সংঘাতের গতি ও প্রকৃতি

হাতিরা সাধারণত লাজুক স্বভাবের হয়। তারা মানুষের সামনে আসতে চায় না। বনে-জঙ্গলে গাছপালার মধ্যে থাকতেই তারা বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সময়ের সাথে সাথে মানুষ বেড়ে যাওয়ার কারণে কমে যাচ্ছে বনাঞ্চল। বাড়তি মানুষের খাবারের জোগান দিতে, নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে প্রয়োজন হচ্ছে নতুন ভূমির। এতে করে হাতিরা হারাচ্ছে তাদের আবাসস্থল, কমে যাচ্ছে তাদের খাবার। ফলে তাদের বন থেকে বের হয়ে ফসলের ক্ষেতে চলে আসতে হচ্ছে খাদ্যের খোঁজে। মানুষ আবার তাদের ফসল রক্ষার জন্য ক্ষেতের চারপাশে তৈরি করছে নানা রকমের ফাঁদ। দিনে দিনে এভাবে নানামুখী আক্রমণের ফলে মারা পড়ছে হাতিরা। এর ফলে তারা হয়ে উঠছে আক্রমণাত্মক ও প্রতিশোধপরায়ণ। মানুষ এবং হাতির এই বিপরীত ও দ্বন্দ্বমুখি অবস্থানের ফলে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয় সেটাই মানুষ-হাতি সংঘাত। এ সংঘাতে কখনো হাতি প্রাণ হারাচ্ছে, কখনোবা মানুষ। কখনো হাতির সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো মানুষের ক্ষেত-ঘর-বাড়ি সব। বাংলাদেশে পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী হাতিগুলোর তুলনায় শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা এলাকার অভিবাসী হাতির দ্বারা মানুষ-হাতির সংঘাত বেশি লক্ষ্য করা যায়।

৩.২ মানুষ-হাতি সংঘাতের কারণসমূহ

মানুষ-হাতি একই এলাকায় অবস্থান করলে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। সংঘাতের নানামাত্রিক কারণ থাকতে পারে। তারপরও মানুষ-হাতি সংঘাতের বেশ কিছু ধরণ লক্ষ্য করা যায়। এখানে মানুষ-হাতি সংঘাতের কিছু মূল কারণ আলোচনা করা হলো।

বাসস্থান পরিবর্তন

হাতি খুব বড়সড় প্রাণী। চলাফেরা এবং খাবার খোঁজার জন্য তাদের বেশি জায়গার দরকার হয়। কিন্তু মানুষ তাদের জীবনযাপন থেকে শুরু করে শিল্প-কলকারখানা, রেললাইন, রাস্তা, ব্রিজ, পানি সেচ প্রকল্প ইত্যাদি নানাবিধ কারণে হাতিদের বাসস্থান, করিডোর এবং বিচরণভূমি ধ্বংস করছে। এতে করে হাতিদের বেঁচে থাকা এবং মানুষ থেকে দূরে থাকার জন্য তাদের চেনাজানা পরিচিত এলাকা বারবার পরিবর্তন করতে হচ্ছে। ফলে যখনি তারা লোকালয়ের কাছাকাছি যাচ্ছে, তখনই তৈরি হচ্ছে হাতি-মানুষের দ্বন্দ্ব। সেখান থেকেই সংঘাত।

হাতি চলাচলের রাস্তায় মানুষের আবাসন ও স্থাপনা নির্মাণ

হাতিরা খাবারের খোঁজে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যে রাস্তা দিয়ে যায়, সেখানে বা তার আশপাশে মানুষজন এসে বসতবাড়ি বা স্থাপনা নির্মাণ করলে হাতিদের চলাচলে বিঘ্ন তৈরি হয়। এতে করে তাদের অনেক রাস্তা পুনরায় ঘুরে যেতে হয়। তখনই শুরু হয় মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব। এছাড়াও জ্বালানি কাঠ, মধু, খাদ্যদ্রব্য এবং বিভিন্ন খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য মানুষের ক্রমাগত বনে প্রবেশের ফলে হাতি তার সহজাত ভীতিবোধটুকু হারিয়ে ফেলে। একসময় বেপরোয়া হয়েই মানুষকে আক্রমণ করে বসে।

ত্রুটিপূর্ণ বনায়ন কৌশল

আগে যেসব বনে বাঁশ, বেতগাছ ছিল মানুষ সেগুলো নিজেদের প্রয়োজনে কেঁটে সেখানে সেগুন, ইউক্যালিপটাসসহ নানা রকমের বিদেশি গাছ লাগিয়েছে। অথচ এ গাছগুলো হাতিদের জন্য উপযোগী নয়। এতে করে হাতিরা তাদের খাবার গাছ, লতা সর্বোপরি আশ্রয় হারাচ্ছে। খাবারের সংকট বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের ছুটতে হচ্ছে দূর থেকে বহুদূরে। চলতি পথে পড়ছে লোকালয়, সেখানে মানুষ নিজেদের বাঁচানোর জন্যই মুখোমুখি হচ্ছে হাতির সাথে, ফলে বাড়ছে সংঘাত।

কৃষিজমির প্রতি আকর্ষণ

হাতি দিনের প্রায় ১৬-২০ ঘণ্টা সময় খাবার খাওয়া এবং খাবার খোঁজার কাজে ব্যয় করে। একদিকে জঙ্গলে যেমন আছে খাবারের অপ্রতুলতা, তেমনি হাতির জন্য জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে খাবার খোঁজা অনেক কষ্টকর একটা কাজ। এ জন্যই যেখানে খাবারের প্রাচুর্য থাকে হাতিরা মূলত সেখানেই বেশি যাতায়াত করে। আর বনের পাশে লোকালয় গড়ে উঠলে সেখানকার ফসল হয়ে ওঠে হাতিদের প্রিয় খাবার। ধান হাতিদের পছন্দের খাবার। ফলে বনাঞ্চলের সন্নিকটে লোকালয় আছে এমন এলাকার ফসলি জমিতে হাতিরা এখন জঙ্গলের চাইতে বেশি সময় ব্যয় করে।

৩.৩ মানুষ-হাতি সংঘাতের প্রতিকারসমূহ

সংঘাত কখনোই ভালো ফল বয়ে আনে না। সংঘাতে সবসময় ক্ষতিই হয়। হয় মানুষের জানমালের ক্ষতি নতুবা হাতি মারা যায়। মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনের জন্য অনেক আগে থেকেই মানুষ নানাভাবে চেষ্টা করে আসছে। নিজেদের প্রাণ, বাসস্থান এবং ফসলের জমি বাঁচানোর জন্য যুগে যুগে মানুষ হাতিদের বিরুদ্ধে নানারকম পদক্ষেপ নিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যবহৃত পদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হলো ।

- ১৯৭৫ সালের জুন-জুলাই মাসে ভারতে হাতির ওপর কাঁদানে গ্যাসসহ বিভিন্ন ধরনের গ্যাস ছুড়ে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখা হয়েছিল। এতে করে সাময়িকভাবে হাতিরা পালিয়ে যেত। কিন্তু বন্যহাতির জন্য এ গ্যাস ছিল বিপজ্জনক, কারণ একবার খেপে গেলে আর রক্ষা ছিল না। তার ওপর গ্যাস ছাড়ার সময় বাতাস উল্টো দিকে বইলে যিনি গ্যাস ছুড়ছেন, তারই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। কাজেই এ পদ্ধতি সংঘাত কমাতে খুব একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

- ১৯৮০ সালের প্রথমদিকে ভারতে হাতিকে ভয় দেখাতে বাঘের ডাক রেকর্ড করে বাজানো হয়েছিল এবং বাঘের মূত্র ফসলি জমির আশপাশে ছিটিয়ে হাতির প্রতিক্রিয়া দেখা হয়েছিল। এতে করে হাতিরা সাবধান হয়ে যায় এবং সামনে এগুতে দ্বিধা করে। তবে এ পদ্ধতির সবচাইতে বড় সমস্যা হলো বাঘের ডাক শুনে হাতি অনেক সময়ই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত, এবং পরে ধীরে ধীরে তারা এই রেকর্ডকৃত ডাকের সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ফলে এ পদ্ধতিও সংঘাত কমাতে দীর্ঘমেয়াদে খুব একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

- ২০০২-০৩ সালের দিকে ভারতে লোকালয়ে চলে আসা কিছু হাতির গলায় রেডিও কলার পরানো হয়েছিল। ফলে হাতিরা গ্রামের কাছাকাছি এলে আগে থেকেই সংকেত পাওয়া যেত, এতে করে গ্রামবাসী পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকত এবং ক্ষয়ক্ষতি অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেক কম হতো। এ পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকর, তবে বেশ ব্যয়স্বাপেক্ষ ও কৌশলগত দিক থেকে বেশ কঠিন।

- ২০০৬-০৭ সালে ভারতে ফসল রক্ষার জন্য শুকনো মরিচের গুঁড়ো ছুড়ে হাতি তাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এতে দেখা যায় মরিচের গন্ধে হাতি আর সামনে আসে না। তবে এ পদ্ধতি বাতাসের বিপরীতে প্রয়োগ করা হলে খুব একটা কাজে দেয় না।

বিগত দুই দশক ধরেই বাংলাদেশে মানুষ-হাতির সংঘাতের নানা ঘটনা অধিকতর দৃশ্যমান হচ্ছে। সুতরাং ধারণা করা যায়, মানুষ-হাতির সংঘাত বাংলাদেশে ক্রমশ বাড়ছে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানুষ-হাতি সংঘাত এড়ানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে মানুষ-হাতির সংঘাত নিরসনে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেশ কিছু পদ্ধতি সংঘাত নিরসনে স্থানীয়ভাবে কার্যকর বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। তার কয়েকটি পদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হলো।

ওয়াচ টাওয়ার পদ্ধতি :

ওয়াচ টাওয়ার হলো দূর থেকেই হাতির চলাচলের উপর নজর রাখার জন্য উঁচু গাছ বা টাওয়ারের উপর স্থাপিত পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প। ওয়াচ টাওয়ার হাতি-মানুষ সংঘাত নিরসনের জন্য অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি বলে বিবেচিত। যে সকল এলাকাতে প্রায়শই হাতি আসে, সেখানে গ্রামের ও বনের সীমানায় ওয়াচ টাওয়ার স্থাপন করা যেতে পারে। এতে করে বন থেকে হাতি বের হওয়া মাত্রই গ্রামের লোকজন খবর পেয়ে যাবে এবং আসন্ন সংঘাত থেকে বাঁচতে খুব দ্রুতই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

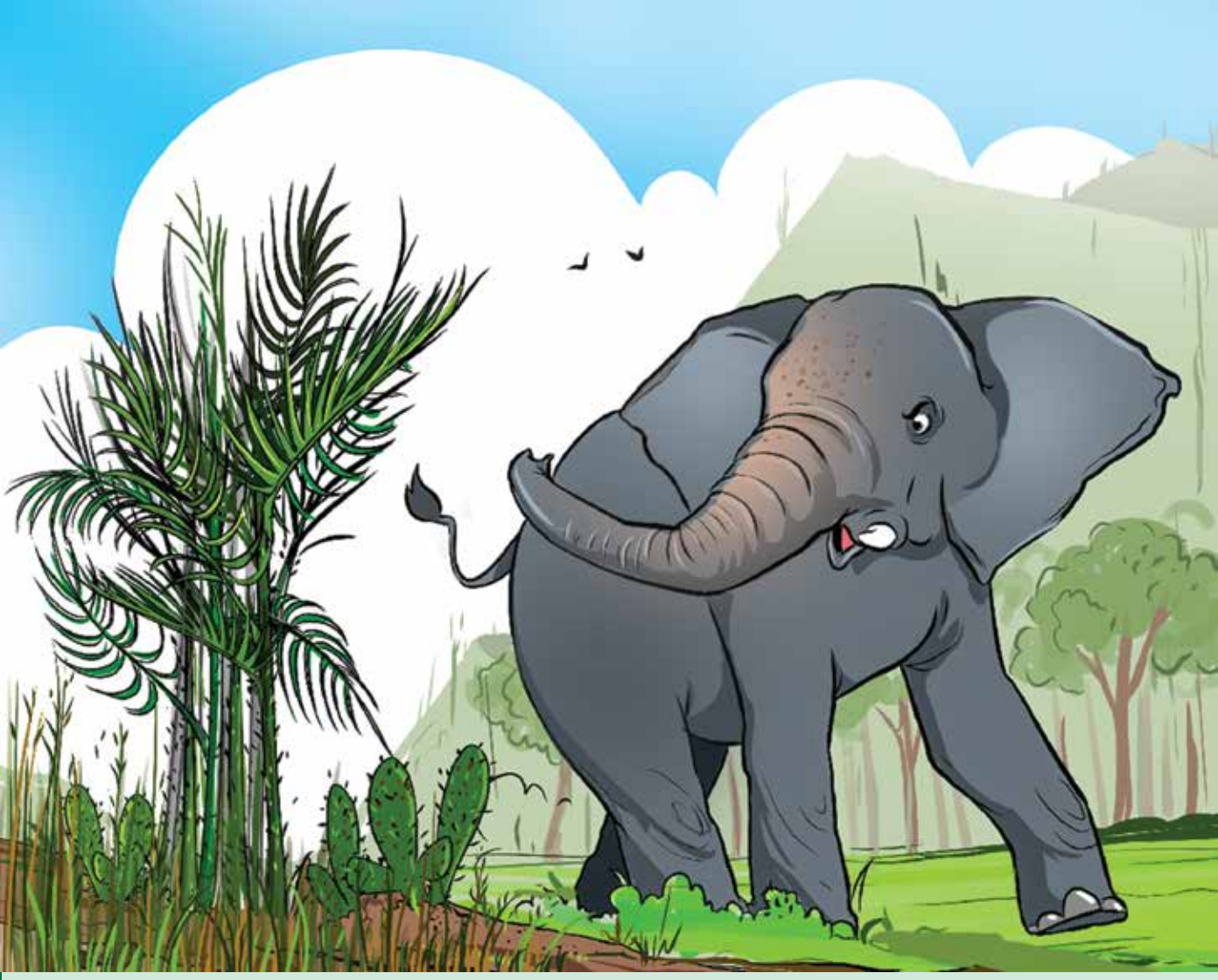

হাতির অপছন্দের উদ্ভিদ দিয়ে প্রাকৃতিক বেষ্টনী পদ্ধতি :

কাঁটাযুক্ত এবং ছোট ছোট বীজ আছে এমন গাছ বা উদ্ভিদ হাতি এড়িয়ে চলে। যেমন বরই, বেত, লেবু কিংবা মান্দার গাছ ইত্যাদি। কেননা বরইয়ের বীজ হাতির পায়ের নিচে পড়লে সে খুব অস্বস্তিতে পড়ে যায়, একইভাবে বেত কিংবা মান্দার গাছের কাঁটার খোঁচাও হাতি সহ্য করতে পারেনা। এ ধরনের গাছপালা দিয়ে ফসলের জমি ঘেরাও দিয়ে রাখলে এতে হাতির আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

বিদ্যুৎচালিত বেড়া পদ্ধতি :

বিদ্যুৎচালিত বেড়া বলতে হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচতে বিদ্যুতায়িত তার দ্বারা কোনো জমি বা এলাকা ঘিরে রাখাকে বোঝায়। বিদ্যুৎচালিত বেড়া দিয়ে জমির সীমানা ঘেরাও করার পর যদি সেখানে হাতি আসার চেষ্টা করে তবে হাতিটি ঐ তারের অতি নিম্নমাত্রার বৈদ্যুতিক প্রবাহে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিদ্যুৎচালিত বেড়াতে প্রবাহিত বিদ্যুৎ হতে হবে নিম্নমাত্রার/সহনীয় মাত্রার যার মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র হাতিকে ভয় দেখানো, কোন ক্রমেই হাতিকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া নয়। হাতির স্মৃতিশক্তি অনেক ভালো, একবার কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে সে ঐ বেড়া দেখলেই চিনতে পারবে। ফলে ঐ জমির কাছাকাছি সাধারণত আর আসার চেষ্টা করে না। বৈদ্যুতিক তারে প্রবাহিত বিদ্যুতের মাত্রা সতর্কতার সাথে বিশেষজ্ঞ দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে, নইলে তা অন্যান্য গবাদিপশু এমনকি মানুষের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

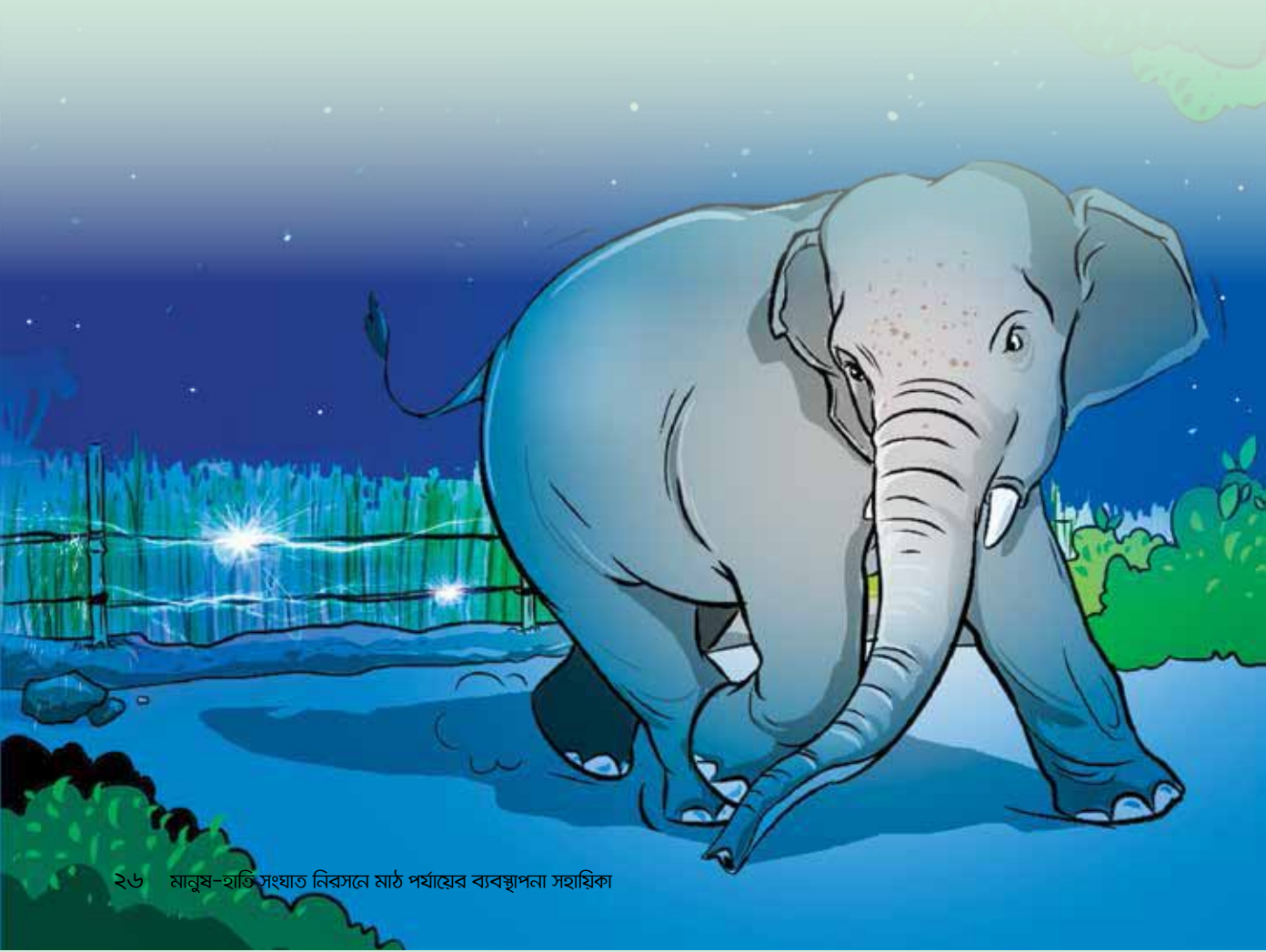

হাতির অপছন্দের শস্য চাষ পদ্ধতি :

মরিচ, আদা, করলা, কাঁকরোল, ঢেঁড়স, কচু ইত্যাদি ফসল হাতিদের খুবই অপছন্দের খাবার। ধানের বদলে এই ফসল চাষ একদিকে যেমন বেশি নিরাপদ, অন্যদিকে তেমনি লাভজনকও বটে। এসব ফসলের দিকে হাতি সাধারণত ফিরেও তাকায় না। কাজেই চাষিরা যদি হাতির অপছন্দের শস্যগুলো চাষ করেন, তাহলে হাতির আক্রমণের হার কমে যাবে।

জমির ধরনের উপর নির্ভর করে হাতির অপছন্দের শস্যের ফলন একেক মৌসুমে একেক রকম হয়। হিসেবের সুবিধার্থে নিচের সারনীতে হাতির অপছন্দের শস্যের বাৎসরিক উৎপাদন পঞ্জিকা দেয়া হলোঃ

হাতির অপছন্দের শস্য উৎপাদন পঞ্জিকা													
শস্য	জমির ধরন	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মরিচ	উঁচু-মধ্যম	✓	✓							✓	✓	✓	✓
করলা	উঁচু-মধ্যম		✓	✓	✓	✓	✓						
ঢেড়শ	উঁচু-মধ্যম		✓	✓	✓	✓	✓						
কচু	নিচু					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
কাকরোল	উঁচু-মধ্যম			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
আঁদা	উঁচু-মধ্যম				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
হলুদ	উঁচু-মধ্যম				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
সরিষা	নিচু				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
লেবু	উঁচু-মধ্যম	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
কুল	উঁচু-মধ্যম	✓	✓									✓	✓
পাট	নিচু		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		পৌষ-মাঘ	মাঘ-ফাল্গুন	ফাল্গুন-চৈত্র	চৈত্র-বৈশাখ	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	আষাঢ়-শ্রাবণ	শ্রাবণ-ভাদ্র	ভাদ্র-আশ্বিন	আশ্বিন-কার্তিক	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	অগ্রহায়ণ-পৌষ

ট্রিপ অ্যালার্ম স্থাপন পদ্ধতি :

একটি ধাতব তাঁরে ঘণ্টা বা অ্যালার্ম লাগিয়ে বনের সীমানার গাছগুলোতে লাগিয়ে দেয়া হয়। এই সীমানা অতিক্রম করতে গেলেই হাতির সংস্পর্শে এসে তারটিতে টান পড়ে উচ্চস্বরে ঘণ্টা বেজে ওঠে। এ পদ্ধতিকে বলা হয় ট্রিপ অ্যালার্ম পদ্ধতি। ট্রিপ অ্যালার্ম ব্যবহারের ফলে গ্রামের লোকজন হাতি আসার আগেই সাবধান হয়ে যেতে পারে এবং ফসল ও জানমাল রক্ষায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে পারে। ট্রিপ অ্যালার্ম পদ্ধতি সম্প্রতি চট্টগ্রামের বেশ কিছু এলাকায় অত্যন্ত কার্যকর বলে বিবেচিত হচ্ছে।

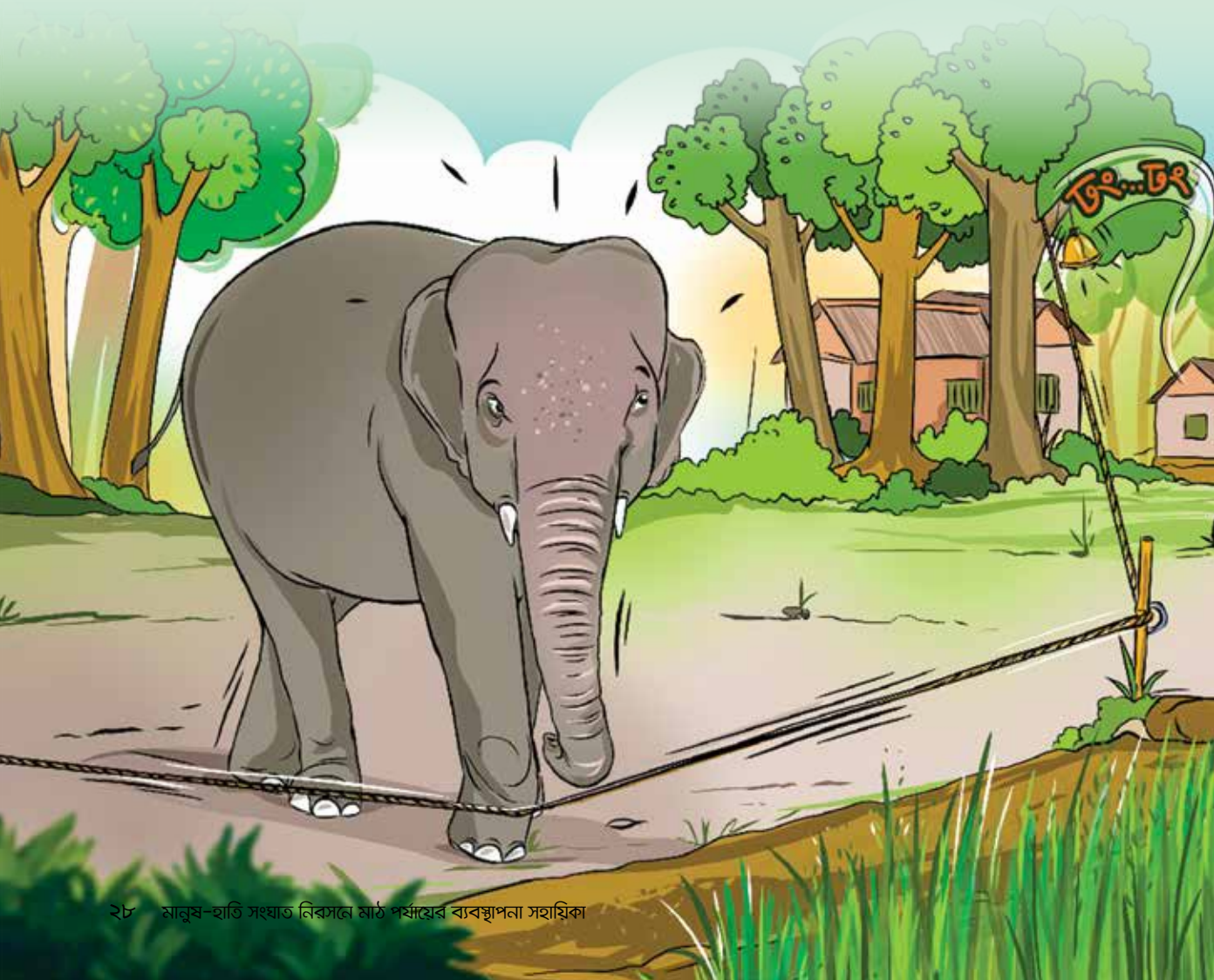

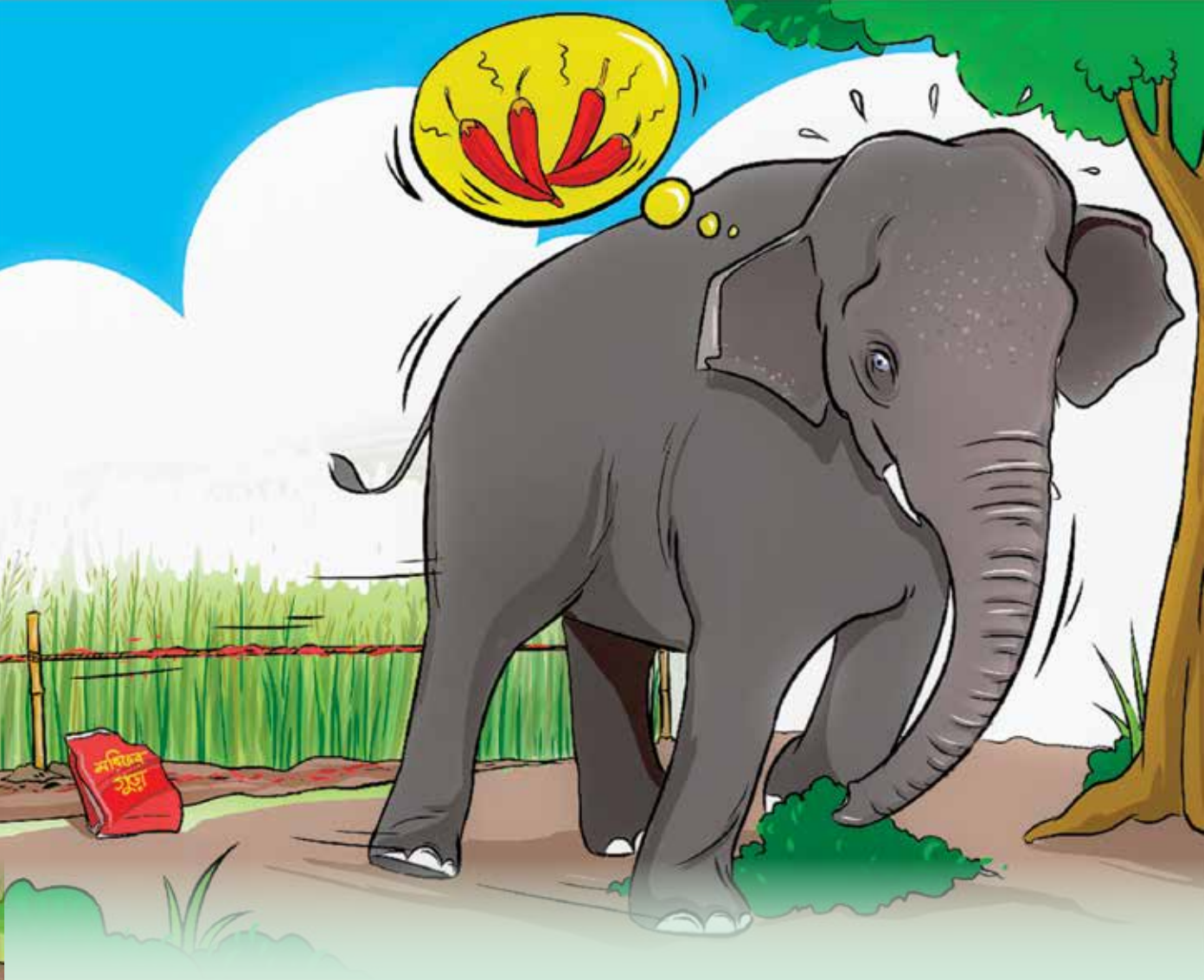

চিলি রোপ বা চিলি স্মোক পদ্ধতি:

চিলি মানে মরিচ। যে কোনো প্রাণীই মরিচ অপছন্দ করে, মরিচের ঝাঁজ কেউই নিতে চায় না। এটাকেই কাজে লাগিয়ে বানানো যেতে পারে চিলি স্মোক বা চিলি রোপ। একটা মোটা দড়িতে আঁঠালো কিছু জিনিসের সাথে মরিচের গুঁড়া মেখে ফসলের ক্ষেতের চারপাশে এমনভাবে রেখে দিতে হবে যাতে করে বাতাসের তোড়ে বনের দিকে মরিচের ঝাঁজটি যায়। হাতি যখনই বন থেকে ক্ষেতের দিকে আসবে তখন তার নাকে মরিচের ঝাঁজ গেলে সে আর এ মুখো হবে না। একইভাবে চিলি রোপ বা রশিতে মরিচ মাখিয়ে ফসলের ক্ষেত ঘিরে দেয়া যেতে পারে।

বনে যখন হাতির খাদ্য সংকট দেখা দেয়, মূলত তখনই হাতি লোকালয়ের দিকে খাবার খুঁজতে চলে আসে। সুতরাং বনে খাবারের জোগান যদি বৃদ্ধি করা যায় তাহলে সংঘাত অনেকটাই কমে আসবে। তাই বনের ভেতরে হাতিবান্ধব নানা ধরনের গাছ লাগানো যেতে পারে, যাতে করে হাতির আর খাদ্য সংকট না হয়। মনে রাখা জরুরি, উপরের প্রতিটি পদ্ধতিতে সুফল ভোগ করতে হলে অর্থাৎ সংঘাত নিরসন করতে চাইলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সেইসাথে আলোচিত প্রতিটি পদ্ধতিরই সফলতা নির্ভর করে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উপর, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

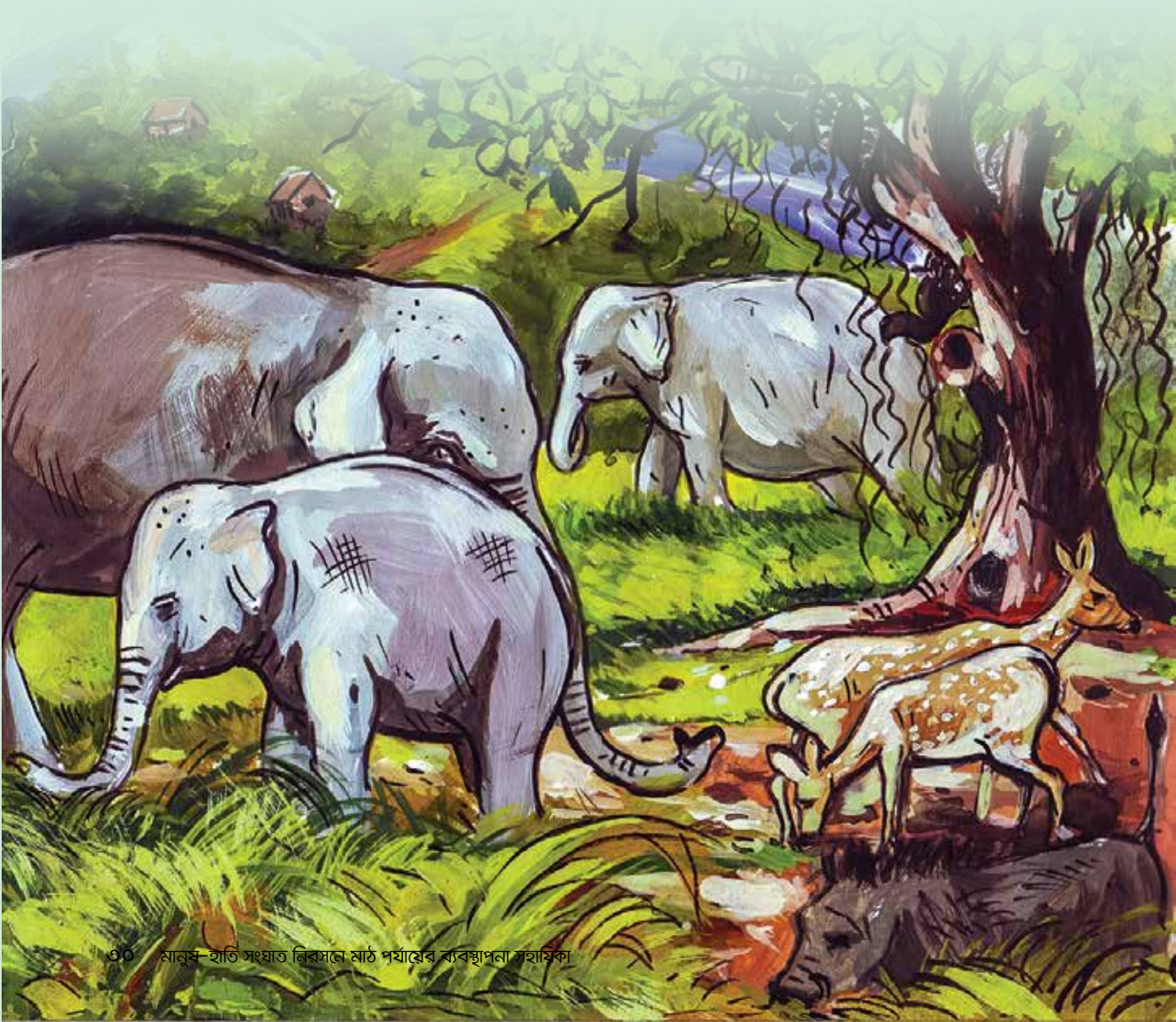

অধ্যায় ৪

সংঘাত নিরসনে মাঠ পর্যায়ে করণীয়

- সংঘাতকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতি
- সংঘাতকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে করণীয়
- মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে স্থানীয় মানুষের ভূমিকা
- মানুষ-হাতি সংঘাতে ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ও করণীয়
- মানুষ-হাতি সংঘাত ব্যবস্থাপনায় সতর্কতা

৪.১ সংঘাতকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতি

অবস্থানভেদে মানুষ-হাতির সংঘাতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু সংঘাত বা দুর্ঘটনা ঘটে বনের ভেতরে এবং কিছু ঘটে গ্রামের ভেতরে। বনের ভেতরে সংঘাত ঘটে তখনই যখন মানুষ বনজসম্পদ সংগ্রহ করার জন্য ভেতরে প্রবেশ করে এবং হাতির মুখোমুখি হয়। অপরদিকে গ্রামের ভেতরে সংঘাত ঘটে তখনই যখন বন্যহাতি বন থেকে বেরিয়ে গ্রামের কাছাকাছি বা সরাসরি লোকালয়ে চলে আসে।

সংঘাত যে স্থানেই হোক তাৎক্ষণিক করণীয় হলো পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে মানুষ ও হাতি উভয়ই ক্ষতির শিকার না হয়। এই সহায়কাটিতে মূলত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব ও গ্রামের ভেতর সংঘাত নিরসনে করণীয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, মানুষ-হাতির সংঘাতের ফলে ফসলের ক্ষতি, সম্পদ বিনষ্ট ও মানুষের জানমালের ক্ষতি হতে পারে, এমনকি হাতিটিও মানুষের হাতে মারা পড়তে পারে। গ্রামের ভেতর সংঘাত হলে এর যে কোনোটি ঘটতে পারে। পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে গ্রামের ভেতরে মানুষ-হাতির সংঘাতকে তিনটি পরিস্থিতিতে ভাগ করা যেতে পারে:

- হাতি যখন গ্রামের পাশের বনে অথবা পাহাড়ে হাঁটাহাঁটি করে এবং তাদের গ্রাম থেকে দেখা যায়
- হাতি যখন গ্রামের ভেতর ফসল ক্ষেতে ঢুকে পড়ে এবং ক্ষেতের ফসল খায় বা নষ্ট করে
- হাতি যখন গ্রামের ভেতরে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে ও ক্ষতিসাধন করে

পরিস্থিতি ১
হাতি গ্রামের পাশের বনে অথবা পাহাড়ে হাটাহাঁটি করছে ও গ্রাম থেকে তাদের দেখা যাচ্ছে

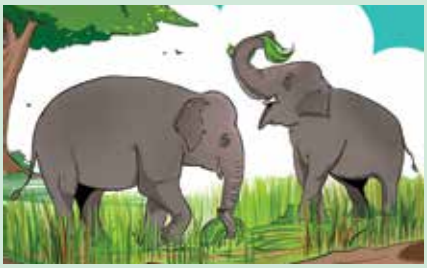

পরিস্থিতি ২
হাতি গ্রামের ফসল ক্ষেতে ঢুকে পড়েছে এবং ক্ষেতের ফসল খাচ্ছে বা নষ্ট করছে

পরিস্থিতি ৩
হাতি গ্রামের ভেতর লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে ও ক্ষতিসাধন করছে

৪.২ সংঘাতকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে করণীয়

মনে রাখা প্রয়োজন, মানুষ-হাতি যতদিন পর্যন্ত একই এলাকায় বসবাস করবে ততদিন সংঘাত কখনই শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। তবে পরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সংঘাতকে অপেক্ষাকৃত কমিয়ে আনা সম্ভব। উপরিউক্ত আলোচ্য প্রতিটি পরিস্থিতিতেই সুনির্দিষ্ট কিছু করণীয় আছে যা পালন করলে সংঘাতের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব বা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

নিচে প্রতিটি পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

পরিস্থিতি ১
হাতি গ্রামের পাশের বনে অথবা পাহাড়ে হাটাহাঁটি করছে ও গ্রাম থেকে তাদের দেখা যাচ্ছে

এ পরিস্থিতিতে কী ঘটে?

এটি হলো মানুষ-হাতি সংঘাতের প্রাথমিক অবস্থা। জঙ্গল আর গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত, এমন অঞ্চলে এ পরিস্থিতি বেশি লক্ষ্য করা যায়। খাবারের খোঁজে হাতি বন থেকে বেরিয়ে এসে পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঢোকার উদ্দেশ্যে যখন লোকালয়ের কাছাকাছি অবস্থান নেয় তখন এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হাতির এরূপ অবস্থানে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সংঘাত সৃষ্টি না হলেও তা গ্রামে এক ধরনের আতঙ্কের সৃষ্টি করে। হাতি সাধারণত মানুষ এড়িয়ে চলে। তাই প্রায়ই দেখা যায়, দিনের বেলা হাতি লোকালয়ের কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করলেও রাতের বেলা ঠিকই লোকালয়ের ভেতর ফসলের ক্ষেতে হামলা করছে। কাজেই এমন পরিস্থিতিতে গ্রামে ঢোকার আগেই যদি হাতিকে ভয় দেখিয়ে বা বাধা দিয়ে ফিরিয়ে দেয়া যায় তবে তা সংঘাত এড়াতে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

সংঘাত নিরসনে এই পরিস্থিতিতে কি করবেন?

- গ্রামের পাশের বনে বা পাহাড়ে হাতি দেখা গেছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হোন।
- স্থানীয় এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিমকে হাতির উপস্থিতির খবর জানান।
- বন বিভাগকে হাতির আগমনের সংবাদ জানিয়ে টহলের জন্য জানিয়ে রাখুন।
- হাতি গ্রামে আসতে পারে এমন সংবাদ দিয়ে গ্রামবাসীকে সতর্ক করে দিন।
- গ্রামের সাধারণ মানুষ মিলে রাতে টহলের ব্যবস্থা করতে পারেন।

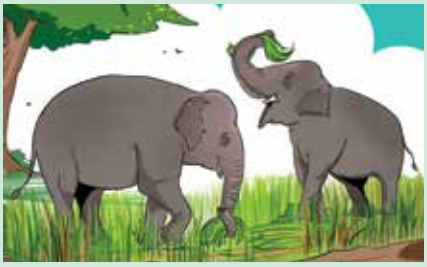

পরিস্থিতি ২
হাতি গ্রামের ফসল ক্ষেতে ঢুকে পড়েছে এবং ক্ষেতের ফসল খাচ্ছে বা নষ্ট করছে

এ পরিস্থিতিতে কী ঘটে?

এটি হলো মানুষ-হাতি সংঘাতের সবচেয়ে নিয়মিত পরিস্থিতি। জঙ্গলের পাশের কৃষিজমি বা হাতির চলার পথের কাছাকাছি কৃষিজমি আছে– এমন অঞ্চলে এ পরিস্থিতি বেশি লক্ষ্য করা যায়। তীব্র খাদ্যাভাবে থাকা হাতির জন্য কৃষিজমির শস্য সহজলভ্য খাবার হওয়ায় এতে হামলা করতে হাতি আকৃষ্ট হয়। কৃষিজমিতে হামলা করা হাতিকে তাড়াতে গ্রামের মানুষ যখনই চেষ্টা করে তখনই সংঘাতের সূচনা হয়। এ পরিস্থিতিতে হাতিরা শস্য খাওয়া শেষে আবার বনে চলে যাবে নাকি আরো বেশি খাবারের লোভে লোকালয়ের দিকে চলে আসবে– এই ভেবে লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং উত্তেজিত হয়ে আগুন, মশাল, লাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করে হাতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হাতির হামলা থেকে অনেকাংশেই কৃষিজমিকে রক্ষা করা ও ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব।

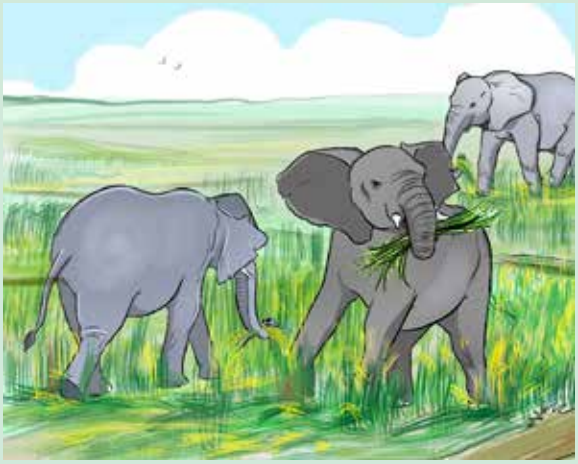

সংঘাত নিরসনে এই পরিস্থিতিতে কী করবেন?

- গ্রামের লোকজন দলবদ্ধ হয়ে হাতিকে ভয় দেখান।
- টিনের মধ্যে লাঠি দিয়ে, পটকা ফুটিয়ে, চিৎকার করে শব্দ করুন। কারণ হাতি শব্দ অপছন্দ করে।
- সম্ভব হলে সার্চলাইট ও টর্চ লাইট জ্বালান বা মশালের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে হাতিকে ভয় দেখান। কারণ হাতি আলো এবং আগুন দুটোই অপছন্দ করে।

পরিস্থিতি ৩
হাতি গ্রামের ভেতর লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে ও ক্ষতিসাধন করছে

এ পরিস্থিতিতে কী ঘটে?

এটি হলো মানুষ-হাতি সংঘাতের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি। জঙ্গলের হাতি গ্রামের ভেতরে বা লোকালয়ে ঢুকে পড়লে সংঘাত অনিবার্য। সে গ্রামে ঢুকে পড়লে ঘর-বাড়ি বা কোনো রকমের স্থাপনাই নিরাপদ নয়। উল্টো হাতির ধাক্কায় ঘর-বাড়ি ভেঙে দেয়ালের চাপে আরো বেশি ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যায়। আবার গ্রামের কোনো মানুষ যদি এ সময় হাতির সামনে পড়ে যায় তাহলেও ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। এরকম পরিস্থিতিতে হাতির পায়ের তলায় চাপা পড়ে সাধারণ গ্রামবাসীর প্রাণ হারানোর সংবাদও মাঝে মধ্যে আমরা শুনতে পাই। আবার হাতির উপর্যুপরি আক্রমণে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষও হয়ে ওঠে ক্ষিপ্ত ও অসহিষ্ণু। ফলে উত্তেজিত গ্রামবাসী প্রায়ই ফাঁদ পেতে রাখে কিংবা সরাসরি পাল্টা আক্রমণ করে। এতে করে হাতি অনেক সময় আহত হয়, এমনকি প্রাণও হারায়। সমন্বিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এক্ষেত্রে সম্পদহানি ও প্রাণহানি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

সংঘাত নিরসনে এ পরিস্থিতিতে কী করবেন?

- অনেকসময় শুধু শুধু গুজব উঠে যে গ্রামে হাতি এসেছে! কাজেই গুজবে কান না দিয়ে প্রথমেই হাতির উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিন।
- গ্রামে হাতির উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া মাত্রই তা বন বিভাগ ও এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম-কে জানান এবং যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার অনুরোধ করুন।

- হাতিকে আঘাত করবেন না, আক্রান্ত হাতি আরো বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠে।
- গ্রামের সবাই দলবদ্ধ হয়ে শব্দ করে, পটকা ফুটিয়ে, আলো জ্বালিয়ে হাতিকে ভয় দেখান।
- হাতিকে চারপাশ থেকে না ঘিরে ফেলে বনের দিকে যাবার সুযোগ করে দিন। ভয় দেখাবার সময় বনের দিকের জায়গাটুকু ফাঁকা রেখে ভয় দেখান, এতে করে হাতি তিন পাশ থেকে শব্দ শুনে এবং ভীতাবস্থা দেখে তুলনামূলক নিরাপদ বনের অংশটুকুতে চলে যাবে।

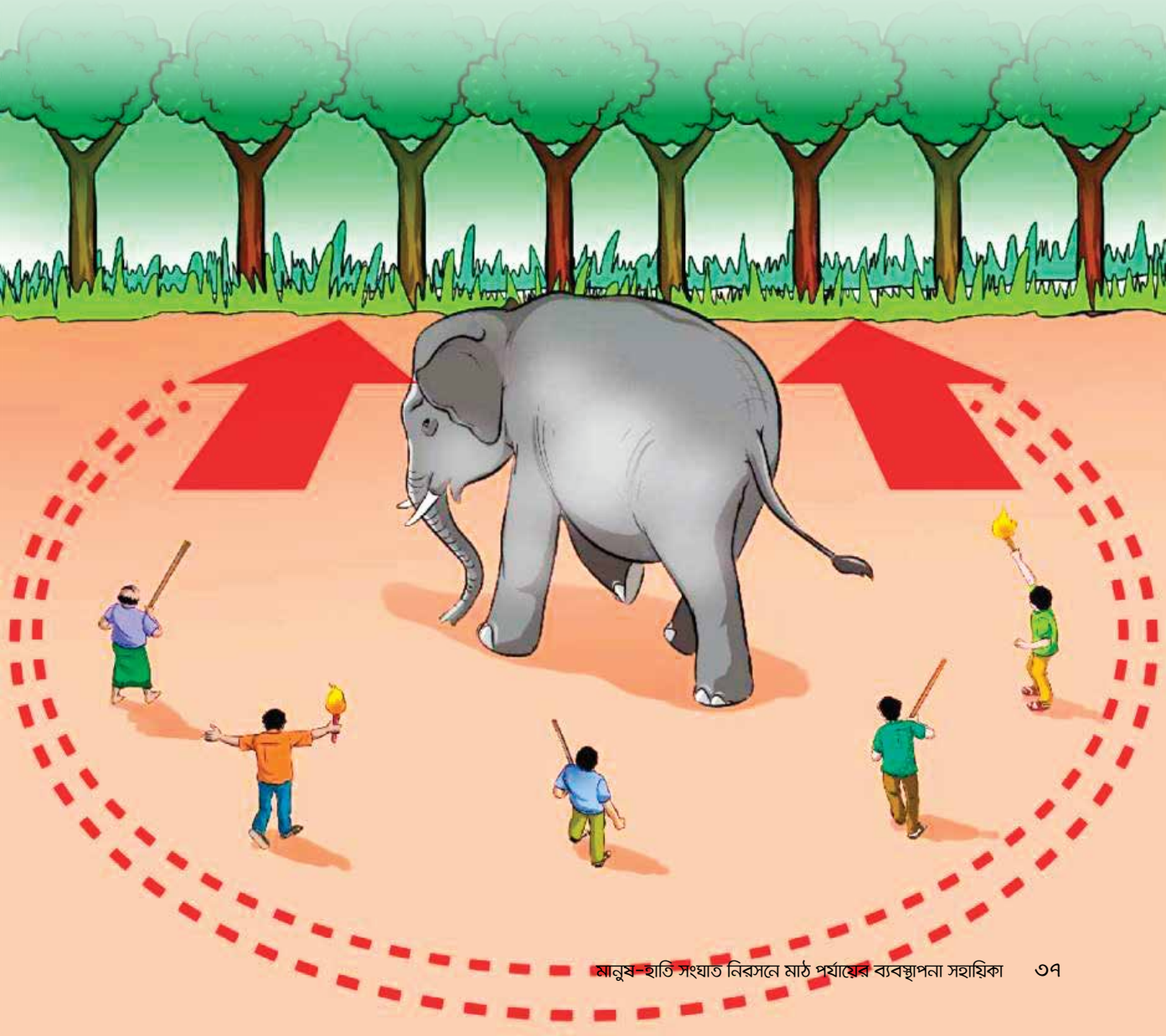

৪.৩ মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে স্থানীয় মানুষের ভূমিকা

বন্যপ্রাণী ও জনগোষ্ঠী যখনই একই এলাকায় বাস করে সেখানেই কিছু না কিছু সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। তাই বন্যপ্রাণীর সাথে সংঘাত নিরসনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সংঘাতপ্রবণ এলাকাতে যে কোনো সময়ই হাতি চলে আসতে পারে, সেহেতু স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সবসময়ই প্রস্তুতি নিয়ে রাখা উচিত। সংঘাত যে কোনো সময়ই হতে পারে তাই সংঘাত প্রতিরোধ করার চাইতে সংঘাত এড়াতে পারলে তা সব দিক থেকেই উত্তম। তাই স্থানীয় মানুষদের হাতি সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে হবে। হাতি জীবনযাপন, খাবার, চলাচল, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি সব বিষয় সম্পর্কে সবার স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এতে করে বিপদকালীন পরিস্থিতিতে কার্যকর ও দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া যায়।

সংঘাত এড়ানোর উপায়

- হাতিরা খেতে অপছন্দ করে এমন ফসল জমিতে চাষ করুন।
- ময়লা-আবর্জনা মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলুন। এসবের গন্ধ হাতিকে আকৃষ্ট করে।
- কাঁঠাল, তেঁতুল, কলা, নারিকেল, গুড়, আখের রস, স্থানীয় মদ ইত্যাদি হাতিরা পছন্দ করে। এসব ফল বা দ্রব্য মজুদ করা থেকে বিরত থাকুন, অথবা এমন কিছু দিয়ে ঢেকে দিন যাতে করে সেগুলোর গন্ধ বাইরে বের হতে না পারে।
- যদি একান্তই রাতের বেলায় বাইরে বের হতে হয় তবে একটি টর্চলাইট সঙ্গে রাখুন। হাতি আলোতে অস্বস্তিবোধ করে।
- হাতি সম্পর্কে আপনি যা জানেন তা অন্যদের জানিয়ে দিন। এতে করে সবাই হাতি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং বিপদে পড়লে কী কী করতে হবে সেই বিষয়ে ধারণা পাবে।
- মাতাল অবস্থায় বনের ভেতরে হাঁটবেন না। হাতি গন্ধের দ্বারা খুব বেশি আকৃষ্ট হয়।
- সাদা বা উজ্জ্বল রঙের কাপড় পরবেন না, এটা হাতিকে আকৃষ্ট করে।
- হাতির খাওয়া-দাওয়ার সময় তাকে বিরক্ত করবেন না।
- জঙ্গলে ধূমপান করবেন না, হাতি যে কোনো বাজে গন্ধে বিরক্ত হয়ে আক্রমণ করতে পারে।
- আপনার বাড়িতে উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করবেন না। যে কোনো উজ্জ্বল রঙ হাতিকে আকৃষ্ট করে। ফলে তা লোকালয়ের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সংঘাতের মুখোমুখি হলে করণীয়

- হাতি দ্বারা আক্রান্ত হলে কখনো সোজাসুজি না দৌড়ে এঁকেবেঁকে দৌড় দিন, এতে করে হাতিরা আপনাকে খুব সহজে ধরতে পারবে না।
- দৌড়ানোর সময় যদি মনে হয় যে হাতি আপনার থেকেও জোরে দৌড়াচ্ছে তাহলে গায়ের জামা খুলে ফেলে দিন। ফলে সে যখন মাটি থেকে জামাটি তুলবে ততক্ষণে আপনি দূরে সরে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় হাতে পাবেন।
- সমান জায়গায় না দৌড়িয়ে একটু উঁচু-নিচু জায়গা বেছে দৌড় দিন, এতে করে হাতিদের দৌড়াতে কষ্ট হবে এবং সে আপনার পিছু ছেড়ে অন্যদিকে মনোযোগ দেবে।
- কয়েকজন একসাথে হলে চিৎকার করতে থাকুন, হাতি শব্দকে ভয় পায়।
- হাতি তাড়ানোর সময় এমন কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করবেন না যেটাতে হাতি মারা যেতে পারে। কখনো খাবার হাতে নিয়ে হাতিকে খাদ্যের লোভ দেখিয়ে অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা করবেন না। এর ফল খুব একটা ভালো হয় না।

৪.৪ মানুষ-হাতি সংঘাতে ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ও করণীয়

মানুষ এবং হাতির সংঘাতে ক্ষতি দুই পক্ষেরই হয়, হয়তো হাতি মারা যায় বা আহত হয় অথবা মানুষ আহত বা নিহত হয়। মানুষের আহত বা নিহতের সাথে আরেকটি বিষয় হলো, হাতি ঘরবাড়ি আর ক্ষেত-খামারও নষ্ট করে দিয়ে যায়। জীবনের ক্ষতি তো আর কোনোভাবেই পোষানো সম্ভব হয় না; তবুও জীবন, ঘরবাড়ি ও জীবিকার ক্ষতি যতটুকু সম্ভব পূরণ করার চেষ্টা বাংলাদেশ সরকার করে থাকে। তবে তার জন্য চাই নির্দিষ্ট কাগজপত্র ও প্রমাণপত্র। হাতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে খুব তাড়াতাড়ি (অনধিক ৩০ দিনের ভেতর) ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে হয়। অন্যথায় সময় যত যাবে, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনা ততই কমে যেতে থাকবে। পরের পৃষ্ঠাতে ছকের মাধ্যমে হাতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রক্রিয়া তুলে ধরা হলো।

ক্ষতিপূরণ: কীভাবে পাবেন?

আপনি কি হাতি দ্বারা
আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন?

হ্যাঁ

নিকটস্থ ফরেস্ট বিট/রেঞ্জ অফিস অথবা
উপজেলা পরিষদ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবীর
আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছেন কি?

হ্যাঁ

গবাদি পশু ক্ষতিগ্রস্ত হলে উপজেলা প্রাণীসম্পদ
কর্মকর্তা থেকে সনদ সংগ্রহ করেছেন কি?

কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হলে জমির মালিকানার
যথাযথ কাগজপত্র (দলিল, খাজনা, দাগ নম্বর)
সংগ্রহ করেছেন কি?

হ্যাঁ

শারীরিকভাবে আক্রান্ত/ক্ষতিগ্রস্ত হলে ডাক্তারি
সনদ সংগ্রহ করেছেন কি?

নিকটস্থ থানায় জিডি করেছেন কি?

হ্যাঁ

আবেদন পত্র সংগ্রহ করার পর তা যথাযথভাবে পূরন করা হয়েছে কি?
আবেদনের সাথে: ১) জিডির কপি; ২) ডাক্তারি সনদ; ৩) জমির
কাগজপত্র ইত্যাদি সংযুক্ত করেছেন কি?

হ্যাঁ

রেঞ্জ অফিসার অথবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার
নিকট আবেদন পত্রটি জমা দিতে হবে

মনে রাখবেন

এই ক্ষতিপূরণ আবেদনপত্র জমা দেয়া আপনার দায়িত্ব।
সঠিকভাবে আবেদন করলে আপনি অবশ্যই ক্ষতিপূরণ পাবেন।

ক্ষতিপূরণ: কখন পাবেন? কারা পাবেন?

যখন কারও ফসল বা ঘরবাড়ি বা গবাদিপশু হাতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়	যখন কেউ হাতি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত/পঙ্গু হয়	যখন কেউ হাতির আক্রমণে প্রাণ হরায়

ক্ষতিপূরণ তালিকা

ক্ষতির ধরন	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
ফসল/ঘরবাড়ি/গবাদিপশু ক্ষতিগ্রস্ত হলে	সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা)
মানুষ পঙ্গু/শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)
মানুষ প্রাণ হারালে	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)

মনে রাখবেন

এই ক্ষতিপূরণ পাওয়া আপনার অধিকার

তবে আবেদন করতে হবে অবশ্যই ৩০ দিনের মধ্যে

বন অধিদপ্তর

৪.৫ মানুষ-হাতি সংঘাত ব্যবস্থাপনায় সতর্কতা

হাতি নিয়ে কাজ করা আসলে খুব একটা সহজ ব্যাপার না। হাতি অনেক বড় একটা প্রাণী, আর বড় প্রাণী বলেই তার শক্তি অনেক বেশি, সেই সাথে হাতি বুদ্ধিমানও। কাজেই এমন এক প্রাণীর সাথে বা তার আশেপাশে কাজ করাটা সবসময়ই কঠিন। প্রতিটি মুহূর্তেই নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য চারপাশে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। ই.আর.টি. সদস্য, বন বিভাগের কর্মী, স্থানীয় প্রতিনিধি, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কর্মী এবং স্থানীয় জনসাধারণসহ আপনারা যারাই হাতি নিয়ে কাজ করছেন তারা খুব সাবধান হয়ে কাজ করবেন। একটি মাত্র ভুল সিদ্ধান্তের জন্য হয়তো সারাজীবন আফসোস করতে হতে পারে।

কাজেই যা-ই করুন না কেন, হাতি নিয়ে যাদের ভালো জ্ঞান আছে তাদের সাথে পরামর্শ করে নেবেন, অযথা হাতিকে উত্ত্যক্ত করবেন না, হাতির রাস্তায় চলাচলের পথে বাধার সৃষ্টি করবেন না। এতে করে আপনার জীবনের ওপর থেকে ঝুঁকি যেমন কমে যাবে, তেমনি করে আপনার লোকালয়ের ওপর থেকেও ধ্বংসের পরিধি ধীরে ধীরে কমে যাবে। মানুষ-হাতি সংঘাতের একেবারে স্থায়ী কোনো সমাধান করা সম্ভব নয়। মানুষ এবং হাতিকে একসাথে মিলেমিশেই থাকতে হবে। এজন্যই খেয়াল রাখতে হবে, কেউ যেন কারো ক্ষতি করতে না পারে। এই দুটি প্রাণীর মধ্যে শুধু মানুষই যেহেতু বুঝদার, সেহেতু বুঝে নেয়া এবং বোঝানোর গুরুদায়িত্বটুকু তাকেই নিতে হবে। নিজেকে, নিজের পরিবারকে ও লোকালয়কে রক্ষার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই হাতি মারবেন না। মনে রাখবেন, হাতি আমাদের জাতীয় সম্পদ। হাতি করলে সংরক্ষণ, রক্ষা হবে সবুজ বন, রক্ষা হলে সবুজ বন, বাঁচবে সব মানুষের জীবন। তাই আমাদের সবার উচিত হাতি রক্ষা করা।

© আইইউসিএন/ সুলতান আহমেদ

অধ্যায় ৫

এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম

- এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম কী?
- এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠনের উদ্দেশ্য
- এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম সদস্যদের কাজ

৫.১ এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম কী?

এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম বা সংক্ষেপে ই.আর.টি. হলো বাংলাদেশের মানুষ-হাতি সংঘাতপ্রবণ এলাকাগুলোতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে, স্থানীয়পর্যায়ে পরিচালিত, মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসন ও হাতি সংরক্ষণে একটি অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী দল। স্থানীয় গ্রামবাসীরাই এ এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিমের সদস্য। এ দলে যারা আছেন তারা সবাই স্বেচ্ছায় নিজের এলাকার হাতি ও বন বাঁচাতে এ কাজ করে থাকেন। এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম স্থানীয় পর্যায়ে বন ও হাতি রক্ষায় বাংলাদেশের প্রথম ও সবচেয়ে বৃহত্তম জনমুখী উদ্যোগ। বাংলাদেশের শেরপুর ও চট্টগ্রামের মানুষ-হাতি সংঘাতপ্রবণ গ্রামগুলোতে বন বিভাগের অধীনে হাতিদের রক্ষার্থে এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠিত হয়েছে। জুন ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট ৩০ টি দলে রয়েছে ৩০০ জনেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক।

উল্লেখ করা যেতে পারে এই দলগুলো তৈরি করা হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে। তাই ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী এই দলের সংখ্যা আরো পরিবর্তন হতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে গঠন করা হলেও ইতিমধ্যেই স্থানীয় গ্রামবাসী দলগুলো থেকে সুফল পাওয়া শুরু করেছে। হাতি ও বনের প্রাথমিক ব্যাবস্থাপক হিসেবে এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম এখন স্থানীয়ভাবে পরিচিত এবং স্বীকৃত।

৫.২ এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠনের উদ্দেশ্য

- মানুষ-হাতি সংঘাত চলাকালীন সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে জরুরি ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করা
- মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে গ্রামবাসী এবং বনবিভাগের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা
- হাতির আক্রমণ থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করা
- হাতির আক্রমণ থেকে গ্রামের ফসল ও ঘরবাড়ি রক্ষার জন্য উদ্যোগ নেয়া
- আক্রমণের সময়ে উত্তেজিত গ্রামবাসীকে নিয়ন্ত্রণ করা
- মানুষের আক্রমণ থেকে হাতিকে রক্ষা করা
- হাতি গ্রামে চলে এলে তার ক্ষতি না করে বনে ফিরিয়ে দেয়ার পদক্ষেপ নেয়া
- গ্রামের সাধারণ মানুষদের হাতির জীবন আচরণ সম্পর্কে আরো বেশি ধারণা দেয়া
- গ্রামের সাধারণ মানুষকে হাতি সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা

৫.৩ এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম সদস্যদের কাজ

ই.আর.টি মূলত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যাদের মূল কাজই হলো বন ও বন্যপ্রাণীর প্রধান সামাজিক রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করা। এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিমের কাজগুলো নিম্নরূপঃ

- হাতি গ্রামে বা ফসলের ক্ষেতে অবস্থানকালে বা সংঘাতকালে টহল দেয়া। এতে করে হাতিকে আসতে দেখলে আগে থেকেই সবাইকে সতর্ক করে দেয়া সম্ভব হয় এবং সবাই হাতিকে আবার বনে ফেরত পাঠাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।
- স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনমানুষের মন থেকে হাতি সম্পর্কে ভুল ধারণা বা প্রতিহিংসাপরায়ণতা দূর করার চেষ্টা করা। এর ফলে স্থানীয় মানুষেরা হাতি সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে পারে। হাতি কেন গ্রামে আসে, কোন্ কোন্ মৌসুমে আসে, কী করলে আর আসবে না, হাতির

আসলে কোথায় থাকা উচিত, হাতি কীভাবে জীবনযাপন করে ইত্যাদি সম্পর্কে ই.আর.টি-এর সদস্যরা জনসাধারণকে ধারণা দিয়ে থাকেন।

- যখন কোনো গ্রামে বা ফসলের ক্ষেতে হাতির পাল চলে আসে তখনই জরুরি অবস্থা তৈরি হয়। এত অল্প সময়ে হয়তো বন বিভাগকে অনেক সময়ই খবর দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। একদিকে উৎকণ্ঠিত ও উত্তেজিত জনতা, অন্যদিকে ক্ষুধার্ত হাতির পাল-একটু অসাবধান হলে বা একটু উত্তেজিত হলে মুহূর্তেই সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। এ রকম পরিস্থিতিতে ই.আর.টি দায়িত্ব পালন করে। স্থানীয় জনগণকে উত্তেজিত হওয়া থেকে বিরত রাখে এবং হাতির পালকে ভয় দেখিয়ে, শব্দ করে, আবার বনে ফেরত পাঠায়। এতে করে হাতি এবং মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
- হাতি-মানুষ সংঘাতকালে যতক্ষণ পর্যন্ত বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের বা উচ্চপর্যায়ের কেউ ঘটনাস্থলে এসে না পৌঁছান ততক্ষণ পযন্ত ই.আর.টি-এর সদস্যরা হাতিদের রক্ষার জন্য সেখানে বিকল্প কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
- ই.আর.টি-এর সদস্যরা বিভিন্ন শিক্ষা এবং সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বন ও হাতি রক্ষায় সম্পৃক্ত করে থাকেন।

© আইইউসিএন/ সুলতান আহমেদ

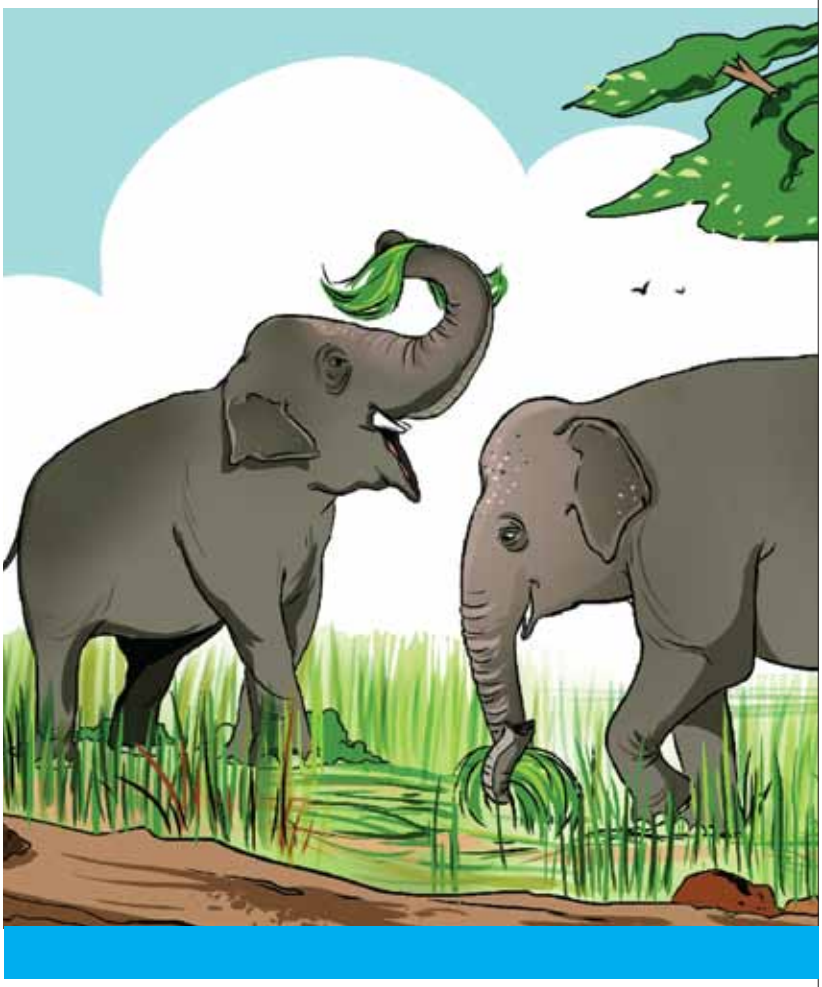

আইইউসিএন
বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস
বাড়ি নং - ১৬, সড়ক নং - ২/৩, বনানী
ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ

বন ভবন
প্লট নং: ই-৮, বি-২
আগারগাঁও, শের-ই বাংলা নগর
ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ